বামাক্ষেপা

বামাক্ষেপা।

"আলোচনা" সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

[চতুর্থ সংস্করণ]

Published by :—
PANCHANON BAGCHI.
of
Messrs P. M. BAGCHI & Co.
38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

Printed by

PANCHANON BAGCHI.

at the

India Directory Press.

38/1, Musjidbaree Street, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার অসীম বাৎসল্য-স্নেহে আমি আজীবন প্রতিপালিত, যাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্মময় উপদেশাবলী আমার কর্ম্মময় জীবনকে ধর্ম্ম-পথগামী করিতে সতত সচেষ্ট ছিল ;—আমার সেই

পরম পূজনীয়,

ইহকালের একমাত্র আরাধ্য দেবতা

ধার্ম্মিকপ্রবর—

স্বর্গীয় পিতৃ দেবতার

পবিত্র নামে এই গ্রন্থ ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

পূতসলিলা ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে বসিয়া যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জগন্মাতার ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার অমৃতময় নামসুধা চারিদেকে বিকীর্ণ করিতেছিলেন এবং যাঁহার শ্রীমুখবিনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শুধু বাঙ্গলায় কেন, কত দূরতর দেশের সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট মানবের হৃদয়-মরুভূমিকে যখন সরস ও সুশীতল করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অন্য এক মহাপুরুষ বীরভূমে দ্বারকা নদীর তীরে তারাপীঠের শ্মশানে তারা মা'র চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তির বিমল প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া, বিশালাক্ষী মায়ের বিশাল বিশ্বাসদণ্ড ধারণ করতঃ কত বিমূঢ়চিত্ত মানবকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন—আমাদের এই গ্রন্থোক্ত পরম পূজনীয় সাধক **বামাক্ষেপা**। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বামাক্ষেপা উভয়েই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-কুমার, উভয়েই জগজ্জননীর প্রিয় উপাসক, কেবলমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে উভয়েই জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

বাল্যে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিবার সুযোগ তাঁহাদের ঘটে নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র উপনিষদ বা দর্শন প্রভৃতি কিছুই ইঁহাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করে নাই। বোধ হয় এ সকল তাঁহাদের জন্ম জন্মান্তরে জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল; এ জন্মে এ সকল অভ্যাস করা আর তাঁহাদের আবশ্যক হয় নাই। অথবা ইহজন্মে ইঁহারা উভয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারভূতা সর্ব্বশক্তির মূলাধার জগদম্বার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত। পরমহংসদেব

আপনার হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল সাধারণে অকাতরে বিতরণ করিতে ভালবাসিতেন, সদাসর্ব্বদা ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, সময়ে সময়ে ভক্তমণ্ডলী পরিমিলিত হইয়া যত্রতত্র যাতায়াতেও সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। "ক্ষেপা"কিন্তু নিজের ভাবেই বিভোর হইয়া তারাপুরের সেই নিভৃত শ্মশাননিবাসে তারামায়ের মুক্তি-মূলাধার চরণতলে তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। কোথাও যাইতে তিনি তত ভালবাসিতেন না এবং সর্ব্বদা নিজের দেবভাব প্রকাশ করিতেন না। তথাপি মধ্যে মধ্যে তাঁহার আলৌকিক ক্ষমতা, তাঁহার অজানিতভাবে এমনি প্রকাশ হইয়া পড়িত যে, তাহা দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যাইত। শুনা যায়—বামাক্ষেপা জীবনের মধ্যে দুইবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; একবার কালীঘাটে ৺কালীমাতার দর্শনে, আর একবার আমাদের হিন্দুকুলতিলক মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রিয়পুত্র মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পীড়া সময়ে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন পুত্রের কঠিন পীড়ার শান্তির জন্য মহাপুরুষ "ক্ষেপাকে" নিজ ভবনে আনাইয়াছিলেন। এই দুইবার তাঁহার লোকালয় আগমন ভিন্ন স্থানান্তর যাতায়াতের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এককথায় বামাচরণ কোথাও যাইতে বা কাহারও সঙ্গ করিতে তত ভালবাসিতেন না। তিনি বেশী সামাজিক ভাবাপন্ন ছিলেন না বলিয়া তাঁহার জীবনকাহিনীও অতি প্রচ্ছন্ন।

কোন সাধকের জীবনী লিখিতে হইলে লেখককে অনেক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয়। আমি এই পুস্তকে সে সকল অনেক সংগ্রহ করিয়াছি। "ক্ষেপা" সময়ে সময়ে এমন অনেক কথা বলিতেন, যাহা ভাষার স্থান পাইতে পারে না। অনেক সময়ে ইঙ্গিতেই কাজ সারিতেন

সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য সঙ্কলন করিয়া যতদূর সম্ভব বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে সাধক-চরিত্রের অঙ্গহানি হইয়াছে, কি পরিস্ফুট হইয়াছে—বলিতে পারি না। ভক্ত পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক মহাশয় লিখিত "তারা" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

দুর্গাদাস লাইব্রেরী,
১০৫ পঞ্চাননতলা রোড়, হাওড়া।
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল।

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন।

আমি যথোচিত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া গ্রন্থকারে নিকট হইতে কেবলমাত্র চতুর্থ সংস্করণের সর্ব্বস্বত্ত্ব গ্রহণ করত অদ্য দুই হাজার কাপি "বামাক্ষেপা" প্রকাশ করিলাম। পরবর্ত্তী সংস্করণ তাঁহার নিজস্ব রহিল। এবার পুস্তকে কিছু কিছু নূতন অংশ সংযোগ করা হইয়াছে এবং চিত্র গুলি ত্রিবর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আশাকরি, অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও স্বর্গীয় মহাপুরুষের এই উপাদেয় জীবন চরিত্র খানি পাঠকগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে চির বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল।
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীপঞ্চানন বাক্‌চি।

বামাক্ষেপা

অবতরণিকা।

অসংখ্য শাস্ত্র পাঠ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলেই যদি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত মাত্রেই ত' মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেন। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার করুণা-সাগরে অবগাহন করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে ইচ্ছা থাকিলে, অকপট অনুরাগ ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—নতুবা তাঁহার দর্শন পাওয়া অসম্ভব।

ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয়। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, মা মা বলিয়া যে ছেলে কাঁদিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে পারে মা তাঁহাকেই ক্রোড়ে লইয়া থাকেন, অমিয়ময় পীযূষধারা দানে তাহারই তাপিত প্রাণ শীতল করেন। যাহারা কামিনী-কাঞ্চনাদি অসার ক্রীড়ার দ্রব্য লইয়া এই খেলার সংসারে কেবল খেলায় মত্ত থাকে, মা তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও দেখেন না। যাহারা ভক্ত, ভক্তি-সুধাধারে যাহাদের হৃদয়ক্ষেত্র সরল-

উর্ব্বর, তাহাতে বীজ সহজেই উপ্ত হয় এবং সেই কমনীয় পবিত্র আসনই ভগবানের চির-প্রিয়, তিনি বৈকুণ্ঠের রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াও এই আসনে সুখাসীন হইতে সদা ইচ্ছুক। তাই ভক্তের জন্য তিনি বিষ-ভক্ষণেও অমৃতের আস্বাদ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য ভক্তের উচ্ছিষ্টও তাঁহার নিটক অতি উপাদেয় সামগ্রী। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাব নাই, প্রেমাশ্রু-বিগলিত-নেত্রে যিনি কাঁদিতে না শিখিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতই হউন আর অশেষ শাস্ত্রপাঠী মহা তার্কিকই হউন, শ্রীভগবানের দর্শন লাভ তাঁহার পক্ষে আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়। এপক্ষে ভক্তিভাব-সমন্বিত ঘোর মূর্খের আসন সর্ব্বাগ্রে; সরল কোমল ভক্তিভাবপূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তি এ বিষয়ে পণ্ডিত অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভগবান্‌কে লাভ করিতে লইলে, ভক্তি-পথের তুল্য সহজ পন্থা আর নাই তোমাকে কৃচ্ছ্র সাধ্য যোগ-যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, অনাহারে দেহ জীর্ণশীর্ণ করিবার আবশ্যক নাই, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে না, তুমি আপনার ঘরে বসিয়া সেই ভবারাধ্য ধনকে লাভ করিতে পারিবে, তাঁহার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া এই ত্রিতাপ-তপ্ত কলুষিত প্রাণ সুশীতল করিতে পারিবে। ভাই! অনুরাগ-ভরে, প্রাণের কবাট খুলিয়া ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে, নয়ন ভাসিতে ভাসিতে একবার তাঁহাকে ডাক দেখি, কেমন তিনি দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন? ভক্তের নিকটে যে তিনি

চিরবিক্রীত। ভক্ত-প্রাণের কাতর আহ্বান শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না, উধাও হইয়া আসিয়া তোমায় কোলে লইবেন, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। তাই ত' কলির শ্রেষ্ঠ-সাধক শ্রীরামপ্রসাদ তাঁহার অমিয়-মধুর-সঙ্গীতে প্রাণের আবেগভরে গাহিয়াছিলেন ঃ—

"ডাক্ দেখি মন ডাকার মত
শ্যামা কেমন থাক্‌তে পারে ? ।"

জীবের মুক্তিলাভ সম্বন্ধেও নিজ সঙ্গীতে তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

"ওরে সকলের মূল ভক্তি
মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ—

"নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনারে দুখ-চেটে ॥"

তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন—অল্পায়ুঃ কলির জীবের পক্ষে ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ, ভগবল্লাভের সহজ-সাধ্য এরূপ উপায় আর নাই। এই ভক্তিবলেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব ভবারাধ্য-চরণ অনায়াসে লাভ করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। ভক্তি-ভাবে আরাধনা করিতে পারিলে তোমায় কোন আড়ম্বর করিতে হইবে না, কোথাও যাইতে হইবে না, ভক্তের পক্ষে ভগবান্ এই সহজ-সাধ্য উপায় করিয়া দিয়া আপনি তাহাদের নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছেন। যাঁহারা এই ভক্তিপথের

পথিক, যাঁহারা ভক্তিডোরে ভগবান্‌কে বাঁধিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ বীর-সাধক।

আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য এই পুস্তকের অবতারণা করিতেছি, তিনি হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি-ডোরেই ভগবতীকে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন। "বামাক্ষেপার" ভক্তিভাব এতই প্রবল ছিল যে, প্রেমাশ্রু-বিগলিত-নেত্রে দারুণ রৌদ্রে, উত্তপ্ত বালুকায় পড়িয়া অশান্ত ছেলের মত তিনি কি ভাবে মাকে ডাকিতেন, প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহার নিকট কিরূপ বিষম আব্দার করিতেন—এই পুস্তকে সেই চিরকুমার, আজন্ম-সন্ন্যাসী, আনন্দময় সিদ্ধপুরুষ "বামাক্ষেপার" সেই সকল পবিত্র জীবন-কাহিনী বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি থাকিলে তুমি মূর্খ হইয়াও মায়ের শ্রীচরণ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পার! সাধন মার্গে মূর্খ আর পণ্ডিত কোন ভেদাভেদ নাই। বরং মূর্খ—সরল, প্রাণ-ঢালা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আরও সহজে মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তাহা পণ্ডিতের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এই পুস্তকে "সাধক বামাচরণই" তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি লেখা-পড়ার ধার দিয়াও যান নাই, জীবনে কখনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ভগবতীর প্রসাদ-লাভে তিনি যেমন সহজে সক্ষম হইয়াছিলেন, অনেক পণ্ডিত অতি কঠোর যোগ-যাগ করিয়াও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না।

ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ—ধর্ম্মের প্রাবল্য এখানে যত বেশী, তত আর কোথাও নাই। সাধক চরিত্রই ধর্ম্ম-শিক্ষার আদর্শ স্থল। সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হৃদয়ে ভক্তি-ভাব দৃঢ় করিতে পারিলে সহজেই যে এই ভীষণ আবর্ত্ত-সঙ্কুল ভব-জলধি উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, তাহা এই সাধক-চরিত্রে বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাঠক! এই সহজ-সাধ্য সাধনার বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দময়ী বিশ্বজননীর অভয়-পদ-প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। "ক্ষেপার" এই ভাবে ভাবময় হইলে "ক্ষেপীর" চরণ লাভ যে সহজসাধ্য হইবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যের পরিচয়।

তারাপুর ই, আই, রেলের লুপ-লাইন, মল্লারপুর ষ্টেসন হইতে খুব নিকটে দ্বারকানদীর তীরে অবস্থিত। এই তারাপুর গ্রামের সন্নিকটে আট্‌লা নামক গ্রামে ১২৪১ সালে "বামাক্ষেপার" জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সর্ব্বানন্দ পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাধা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। যত কিছু দুর্দ্দৈব সংঘটিত হউক না কেন, একার্য্য তিনি সমভাবেই সম্পন্ন করিতেন, তবে প্রত্যহই যে ঠিক মনে-প্রাণে ঐ কার্য্য সমধা হইত, সংসারীর পক্ষে তাহা সাহস কবিয়া বলা যায় না। কোনপ্রকার ক্রুটী হইয়াছে—বুঝিতে পারিলে, তিনি অভীষ্ট-দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আট্‌লা গ্রামে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণের দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্র দুইটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ বামাচরণ ও কনিষ্ঠের নাম রামচন্দ্র। বাল্যকাল হইতেই বামাচরণের মতি-গতি ধর্ম্মের প্রতি, দেব-দেবীর পূজার

প্রতি নত হইয়াছিল। শৈশবে তিনি লেখাপড়ায় মন না দিয়া অধিকাংশ সময় খেলায় অতিবাহিত করিতেন। খেলার সময় বামাচরণ কালী মূর্ত্তি গড়িতেন, খেলাঘরের নৈবেদ্য দিয়া দেবীর পূজা করিতেন। কালীপূজা শেষ হইলে, স্বহস্তে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গড়িয়া ঐরূপ ভাবে পূজা করিতেন, তারপর ভগবানের রাস-লীলার উৎসব সমাধা করিয়া বামাচরণ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সুখে বিচরণ করিতেন। ধর্ম্মের খেলা ভিন্ন বামাচরণ অন্য খেলায় মন দিতেন না। সঙ্গীগণের সহিত তিনি যখন যে খেলার আয়োজন করিতেন, তাহাতে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মের সংশ্রব থাকিত। ধর্ম্মহীন খেলা বামাচরণ খেলিতেন না, সেরূপ খেলায় তাঁহার প্রবৃত্তিও ছিল না। পিতা, পুত্রকে এইরূপ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ দেখিয়া কিছু বলিতেন না। লেখাপড়ায় বামাচরণ বীতশ্রদ্ধ হইলেও ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত, এই জন্য পিতা কর্ত্তৃক শাসিত না হইয়া বরং উৎসাহিত হইতেন।

বাল্যকালে যাহার যে প্রবৃত্তি বলবতী থাকে, প্রায় সেই প্রবৃত্তি অনুসারেই তাহার জীবন গঠিত হয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, আজ দিবাভাগ কিরূপ কিরণ-মালায় সমাচ্ছন্ন হইবে। মহাত্মা ভগীরথ বাল্যকাল হইতেই জলদানে বৃক্ষলতার জীবন রক্ষা করিতে ভাল বাসিতেন। পিপাসিত ব্যক্তিকে জলদান করিয়া তাঁহার যেরূপ পরিতৃপ্তি হইত, এরূপ আর কিছুতেই হইত না। এই জন্যই তিনি জীবনমধ্যাহ্নে ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-বিহারিণী পতিতপাবনী জাহ্নবীকে ধরাতলে আনিয়া ব্রহ্ম-

শাপগ্রস্ত, তৃষিত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন এবং আবহমান কাল ধরাবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করতঃ চির অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জগতে যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু কখন সে অমরকীর্ত্তি ভুলিতে পারিবেন না। জনে জনে তাঁহার সেই পরম পবিত্র কাহিনী বিঘোষিত করিয়া আপনি পবিত্র হইবে, অপরকেও পবিত্র করিবে। এই জন্য বলিতে হয়, বাল্যকালের ক্রিয়াকলাপ, হাব-ভাব, মতি-গতি দেখিয়া মানুষের জীবন-নাটকের অঙ্কপাত করিতে পারা যায়। আজীবন সে কিরূপ ভাবে অতিবাহিত করিবে—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বালক যদি সৎকর্ম্মান্বিত হয় এবং তাহাতে যদি পিতামাতার উৎসাহ লাভ করে—তাহা হইলে যে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—তাহা কে না স্বীকার করিবে? পিতার উৎসাহে বামাচরণের বাল্যজীবন খুব সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে সেই পার্থিব সৌভাগ্য বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

শৈশবেই বামাচরণের পিতৃ-বিয়োগ হইলে সংসারে তাঁহাদের বড় অভাব হইয়া পড়িল। বামাচরণই একটু মুখধরা হইয়াছিলেন কিন্তু বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেন নাই। কোনও কাজ-কর্ম্ম করিয়া সাংসারিক অভাব মোচন করা বামাচরণের ক্ষমতায় কুলাইল না; লেখাপড়া না জানিলে অর্থ উপার্জ্জন হইবে না, কাজেই তাহার সংসারে কষ্টের একশেষ হইল। রামচন্দ্রও তখন নিতান্ত

শিশু, পৈতৃক-সম্পত্তিও তেমন কিছু ছিল না। অর্থাভাবে দিন দিন সংসার অচল হইয়া পড়িল। জননী তখন বামাচরণকে কোন কাজ-কর্ম্মের যোগাড় দেখিতে বলিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে বামাচরণ যেন সংসার-বিরাগী পাগল হইয়াছেন। সাংসারিক কোন বিষয়েই তাঁহার মন আর তত লিপ্ত হইতে চাহে না। তবে মায়ের আদেশ ত' শিরোধার্য্য করিতে হইবে। মা বলিলেন—"বামাচরণ! পাগ্‌লামি ছাড়, কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখ, এরূপ করিয়া আর কতদিন চলিবে? বাস্তবিক কি আমরা অনাহারে মরিব; কোন কিছু উপায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না?" জননীর সেই স্নেহসিক্ত করুণ অনুজ্ঞা পাগল বামাচরণের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বামাচরণ মনে মনে ভাবিলেন, বিশ্বেশ্বরীর এই বিশ্ব রাজত্বে কেহই অনাহারে মরে না। যখন জীবকে জীবিত রাখিবার জন্য জননীর জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধসঞ্চার হয়, তখন কি সত্যসত্যই আমরা মরিয়া যাইব? দয়াময়ীর দয়ার রাজত্বে কখন কি এরূপ অবিচার হইতে পারে? নিরক্ষর, পাগল বামাচরণের মনে স্বতঃই এই ভাবের উদয় হইত; কিন্তু তাঁহার মা বলিয়াছেন—বামাচরণ কাজের চেষ্টা দেখ, কাজ কর। এমন কি কাজ করি, যাহাতে জীবনে কোনও ভাবনা অনুভব করিতে হইবে না। যদি কাজ করিতে হয়, তবে যাহা প্রকৃত কাজ, যে কাজ করিলে আর কখন কোনও অভাব বলিয়া বোধ থাকিবে না, আমাকে সেইরূপ কাজ করিতে হইবে। বৃথা কাজে সময় নষ্ট

করা হইবে না। এইজন্য সংসার-জ্বালায় যখন তাঁহাকে একান্ত ঝালাপালা হইতে হইত, যখন অভাব-মোচনের আর কোনও কূল কিনারা দেখিতে পাইতেন না, তখন তিনি পাগল-স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তারাপীঠে তারাদেবীর মন্দিরে আসিতেন। বালক যেমন মায়ের নিকট কিছু পাইবার জন্য কাঁদে, ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, পাগল-স্বভাব বামাচরণও বালকভাবে, ভক্তি-গদগদ-চিত্তে সাশ্রু-নয়নে তেমনি দেবীর সম্মুখে আসিয়া বলিতেন,—"তারা! আমাদের কি এমনই দিন যাবে, কষ্টের কি শেষ হবে না মা?" এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে বামার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইয়া বুক ভাসিয়া যাইত। ভক্তের এ কাতর প্রার্থনা কখন কি অপূর্ণ থাকিতে পারে? বামাচরণের হৃদয়ে অসীম শক্তির সঞ্চার হইত। তাঁহার প্রতি দেবীর করুণা-ধারা ছুটিত। এই সময় হইতে বামাচরণ মাতৃ-নামে প্রাণ মাতাইতে লাগিলেন। মাতৃনামে তাঁহার ভক্তির উৎস উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এখন বামাচরণ প্রায় যৌবন সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এরূপভাবে কষ্টকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না। মায়ের উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে অভাব মোচন হইবে নাকি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে কাজ করিবার বাসনা জাগরিত হইল।

একদিন জননীর উত্তেজনায় বামাচরণ তাঁহাকে বলিলেন—"মা! যখন তুমি বলিতেছ, তখন আমি কাজের চেষ্টা করিব।"

মা দেখিলেন—বামা আর সে বামা নাই, সে এখন সমস্ত অভাব বুঝিতে পারিয়াছে—তাই বামার আমার কাজের চেষ্টায় মন পড়িয়াছে। স্নেহময়ী জননী পাগলের কথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—"বাবা! কাজের জন্য তোমার কোথাও যাইবার দরকার নাই। তুমি আমার পাগল ছেলে; তোমাকে কোথাও যাইতে দিতে আমার মন চায় না। তুমি ঘরে থাক, চাষের কাজকর্ম্ম দেখ, তাহা হইলেই আমাদের এক রকম চলিয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের চাষ-আবাদের জমি-জমা যৎসামান্য যাহা ছিল, তাহাতেই চেষ্টা করিলে কষ্টে-সৃষ্টে একপ্রকার চলিতে পারিত। পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া জননী প্রত্যহই এইরূপ ভাবে উৎসাহ ও সৎপরামর্শ দিতেন। বামাচরণ কিন্তু সে কথায় কাণ দিতেন না। যেন কোন এক গভীর চিন্তায় তিনি উন্মনা হইয়া থাকিতেন। জননী তাহার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন,—"মা! ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়া শিখি নাই বটে কিন্তু ঠাকুর-পূজা ত' কর্ত্তে জানি, তাহাও কি কোথাও জুটিবে না?" জননীর নিকট এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ একদিন দেশত্যাগ করিলেন; এবং বিদেশে গিয়া কয়েক স্থানে পূজার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু শিক্ষা অভাবে তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, পদে পদে ঠকিতে লাগিলেন।

বামাচরণের মন এখন আর সংসারের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। ধনের জন্য সামান্য মানুষের

উপাসনা করিতে তাঁহার মন আর চায় না। তাঁহার মন যাহা চায়, যে বস্তু পাইবার জন্য বামাচরণের মন সতত উৎকণ্ঠিত, সংসার তাঁহাকে সে ধন দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় স্বদেশে আসিলেন।

জননী কত বুঝাইলেন। বামাচরণের মন সে কথায় প্রবোধ মানিল না। প্রথম হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সাধন-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি কখন কিরূপভাবে থাকিতেন, তাহার স্থিরতা ছিল না, তাই তাঁহাকে সকলে পাগল বলিয়া অভিহিত করিত। এই সময় হইতেই তাঁহাকে সকলে "বামাক্ষেপা" বলিয়া ডাকিত। পাগল নিজের পাগলামী লইয়াই থাকিতেন। এই জন্য সকলে জানিত "বামা" প্রকৃতই পাগল হইয়াছে। কিন্তু এ পাগলকে চিনিবার ক্ষমতা সংসারসংলিপ্ত, ক্ষুদ্র-প্রাণ, সাধারণ মানবের মধ্যে কয়জনের আছে? প্রাণ যাঁহার পরমার্থ-তত্ত্বের কণিকামাত্র আস্বাদ পাইয়াছে, সে আনন্দ-সমুদ্রে যে একবার অবগাহন করিতে পারিয়াছে, সে তুচ্ছ সংসারের মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি জ্ঞান আর তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। সে জানে, মা-ই তাহার সব, এ সমস্তই তারামায়ের মূর্ত্তি, এ জগৎ মায়ের, মা আমার, আমি তার পাগল ছেলে। কাজেই এ অবস্থায় তাহার পাগল স্বভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এমন যে সুখের সংসার—ভোগ-বিলাস, মান-সম্ভ্রম, ধন-জন প্রভৃতি; যথাকার সৌন্দর্য্যে মানব বিভোর, তথায় যদি কাহাকেও এ সকল বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তখন আমাদের

ন্যায় সংসারাবদ্ধ মানবের চক্ষে সে পাগল ভিন্ন আর কি প্রতীয়মান হইবে? এই জন্যই "বামা" আমাদের "ক্ষেপা" নামেই অভিহিত এবং এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌরাণিক-তত্ত্ব।

বামার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র তারাপুর তারামায়ের নামেই বিখ্যাত, ইহার অন্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব তাদৃশ কিছু নাই। এখানে দ্বারকা নদীর পূর্ব্ব তীরে তারামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া ইহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান। বীরভূম জেলার মল্লারপুর ষ্টেসন হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে চণ্ডীপুর গ্রামের নদী তীরে এই তীর্থ-স্থান। ঐতিহাসিক তত্ত্ব বেশী কিছু না পাওয়া যাইলেও পৌরাণিক তত্ত্ব কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহা এই—প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর তাহার শোভা-সম্পদ্ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। নানা দিক্ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বয়ম্ভূর আনন্দ আর ধরে না। পৃথিবী মহা সুখের স্থান হইল বটে, কিন্তু এই সকল সুখ সম্ভোগ করিবার প্রকৃত পাত্র কে? যে সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে, ইহারাই কি ইহার প্রকৃত অধিকারী অথবা কোন উৎ-কৃষ্টতম বিবেক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারাই এ সুখ-সম্ভোগের উপযুক্ত পাত্র হইবে? পিতামহ ব্রহ্মা এই সকল মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি-বৃন্দ ও নারদাদি মহর্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন—ইহারাই ব্রহ্মার মানস-পুত্র নামে ভুবন-বিখ্যাত। এই সকল মানস-

পুত্রগণের মধ্যে বশিষ্ঠদেব অন্যতম। মানসপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই ভগবানের ধ্যান-ধারণায় নিরত হইলেন। পৃথিবীর এই সমস্ত লোভনীয়, নয়নমনোহর বস্তুর প্রতি তাহাদের মন আকৃষ্ট হইল না। ইহাতে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল। পৃথিবীতে মানবের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার ত' কোন উপায় নির্দ্ধারিত হইল না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মহা চিন্তান্বিত হইয়া পুত্রগণকে বিবাহ করিয়া সৃষ্টির সহায়তা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু কেহই পিতার আদেশ প্রতি-পালন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—বিবাহ করিয়া কামিনী-কাঞ্চনে লোভপরবশ হইলে আমাদের ইহ-পরকাল নষ্ট হইবে; ঈশ্বর-চিন্তায় আর আমাদের মন আকৃষ্ট হইবে না। অতএব আপনি আমাদিগকে এরূপ আদেশ করিবেন না। বিবাহই সকল কষ্টের মূলীভূত কারণ। প্রজাপতি পুত্রগণের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার প্রজা সৃষ্টির বাসনা প্রবল হইয়াছে। তিনি কিছুতেই তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, বরং ক্রোধে অভিভূত হইয়া পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এই ক্রোধের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইলেন প্রজাপতি দক্ষ। তিনি দক্ষকে বলিলেন—"তুমি যেমন আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না, কালে তুমি আমার অভিশাপে জামাতার নিকট অপমানিত হইয়া ছাগমুণ্ড ধারণ করিবে।" তারপর নারদ ও বশিষ্ঠকে "চিরদুঃখী হইতে হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। নারদ হরিপরায়ণ আর বশিষ্ঠ সংযমী, তাঁহারা

বুঝিলেন—এ অমোঘ অভিশাপ ব্যর্থ হইবে না, ইহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। অতএব আর কেন বৃথা সময় নষ্ট করি, তপস্যায় মনঃসংযোগ করাই বিধেয়, ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হইবে। এইরূপে বহুবর্ষ অতীত হইলে, বশিষ্ঠদেব তপস্যা ত্যাগ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন।

বহু দেশ, বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠদেব চীনদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথাকার অধিবাসিগণ তারাদেবীর পূজায় নিযুক্ত ছিল। পূজার উপকরণ মদ্য, মাংস প্রভৃতি। তাপস-প্রবর বশিষ্ঠদেবকে তথায় আসিতে দেখিয়া তাহারা ঐ সকল দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিল। বশিষ্ঠদেব কিন্তু তৎসমস্ত দেখিতে পাইয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন এবং এরূপ পূজার বিধান যে তামসিক ব্যাপার—তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন। চীনের অধিবাসিগণ বশিষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল এবং বলিল—বশিষ্ঠ! তুমি সংযমী এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া মনে বড় স্পর্দ্ধা কর। কিন্তু বল দেখি—প্রকৃত সংযমী কে? যে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আপনার চিত্তকে স্থির রাখিতে পারে সেই জিতেন্দ্রিয়? না পিতার বাক্য অবহেলা করতঃ বিবাহে বিমুখ হইয়া দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়? তুমি যেমন আমাদের রীতিনীতি দেখিয়া ঘৃণা করিলে; সেইরূপ তুমিও জন্মান্তরে এইরূপ ভাবে পূজা না করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।

বশিষ্ঠদেব তাহাদের কঠিন বাণী শ্রবণ করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে

তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিছুদিনের পর চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়া অনশনে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠদেবের এ জন্মের লীলা-খেলা এই স্থানেই শেষ হইল। অনেকে বলেন—ভালমন্দ এক করিতে হইবে—তবে সে প্রকৃত সাধনসিদ্ধ যোগী। পরম তত্ত্ব-জ্ঞানী বশিষ্ঠদেবের ন্যায় মহাপুরুষ যখন এ ভালমন্দ ভেদজ্ঞান-বিরহিত হইয়া সাধনমার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই—তখন আমরা কোন্ ছার? ভাল যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মন্দও তাহা হইতে উৎপন্ন। বশিষ্ঠদেব যখন ইহা ধারণা করিতে পারেন নাই, তখন অল্পবুদ্ধি মানবের সাধ্য কি যে তাহার একত্ব সম্পাদন করিতে পারে?

ভালমন্দ এক করা ভগবানের ইচ্ছাধীন। যখন ভেদজ্ঞান রহিত করিবার আবশ্যক হইবে—তখন সে ভগবদিচ্ছায়ই হইবে—তোমার চেষ্টার তত আবশ্যক হইবে না। তুমি চেষ্টা করিয়া কি করিতে পারিতেছ—আর কি করিতে পারিবে? এ জগতে তোমার ক্ষমতা কতটুকু, অতএব শাস্ত্র মানিয়া চল, সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম।

দ্বারকানদীর তীরে এক বনে কুবুদ্ধ নামে জনৈক মহাতপা ঋষি বাস করিতেন। ঋষির এই আবাস-ভূমি অতি রমণীয় এবং তপোবন সদৃশ শোভায় শোভান্বিত। কুবুদ্ধ সংসার-বাসনা-বিহীন চিরকুমার। এই মহান্ ব্রতে ব্রতী হইয়া ঋষিবর সংসারের যাবতীয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জন-সাধারণের উপকার করিতে, লোকের ক্লেশ নিবারণ করিতে তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত ছিলেন। এই জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ভক্তি করিত।

নদীর পূর্ব্ব-পারে চন্দ্রচূড় রাজার রাজধানী। তথায় চন্দ্রচূড় নামক যে অনাদি লিঙ্গ শিব-স্থাপনা ছিল, তাঁহার প্রসাদে রাজার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সময়ে সময়ে রাণী, দাসীগণ সমভিব্যাহারে চন্দ্রচূড়ের পূজা করিতে আসিতেন এবং সেই সময় মুনিবর কুবুদ্ধেরও চরণ বন্দনা করিয়া যাইতেন। একদা রাণী, স্নানের পর নিজ অভীষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, সঙ্গে তাঁহার দাসী হারাবতী। মুনিবর কুবুদ্ধ সেই বরবর্ণিনী রাজরাণীর রূপমাধুর্য্য সৌন্দর্য্য অনিমিষ নয়নে তপোবন হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন।

রমণীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় না, সে মোহপাশে আবদ্ধ হয় না, জগতে এমন লোক কয়জন ? দৈবক্রমে যতিবর কুবুদ্ধ মহারাণী তারাবতীর সৌন্দর্য্যে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সেই দিন রাণী পবিত্র হৃদয়ে ঋষিবরের চরণ বন্দনা করিতে আসিলে তিনি আপন অভিপ্রায় তাঁহাকে ব্যক্ত করিলেন।

পতিব্রতা তারাবতী মুনিবরের মনোভাব বুঝিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন। একদিকে ধর্ম্মনষ্ট, অপর দিকে মুনির অভিশাপ। রাণী বড়ই বিচলিতা হইলেন। তিনি সহসা সম্মতি দান না করিয়া বলিলেন,—"মহাভাগ ! সন্ধ্যার পর আমি এখানে একাকিনী আসিব।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। লজ্জায় ও দুঃখে রাণী মৃতপ্রায় ; কি করিবেন—কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাণীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া দাসী হারাবতীও অত্যন্ত কাতরা হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি আজীবন দাসীবৃত্তি করিতেছি ; ইঁহাদের অন্নজলেই আমার জীবন পরিপুষ্ট, আমি যদিও নীচ-কুলোদ্ভবা, তথাপি আমারও রূপ আছে। আমি না হয় তারাবতী সাজিয়া মুনিবরের নিকট গমন করি না। তাহা হইলে ত, রাণীর সতীত্ব রক্ষা হইবে। আজীবন যাঁহার অন্নে জীবন ধারণ করিতেছি, তাঁহারই উপকারার্থ না হয় এ জীবন ব্যয়িত হইল। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হারাবতী রাণীর নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তারারতী অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু দাসী তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প—কিছুতেই কথা শুনিল না। শেষে

রাণী তারাবতী দাসীকে স্বহস্তে সুচারুরূপে বেশভূষা করাইয়া বিদায় দিলেন।

সন্ধ্যার পর হারাবতী কুবুদ্ধের আশ্রমে উপস্থিত হইল। কামান্ধ ঋষি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি হারাবতীর সহিত কয়েক বাস অতিবাহিত করিলেন। হারাবতী গর্ভধারণ করিলে কুবুদ্ধের মনে অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন—"হায় আমি কি করিলাম, কেন মজিলাম, কেন মজাইলাম।" অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ঋষিবর ক্রমশঃ জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিলেন। কোরকে কীট প্রবেশ করিলে তাহা যেমন ক্রমশঃ অন্তঃসার-শূন্য হইয়া যায়, ঋষিবরের হৃদয়ে চিন্তা-কীট প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে সেইরূপ তেজোহীন ও দীপ্তিবিহীন করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

এই দাসী হারাবতীর গর্ভজাত শিশুই কালে বশিষ্ঠ নামে ভুবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক অতিশয় ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বশিষ্ঠদেব বাল্যকালেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নিজ প্রতিভাবলে সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে সাধন-বীজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি যৌবনের প্রাক্কালেই জননীর অনুমতি লইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। যৌবনে যোগাবলম্বন করিয়া

তিনি বহুদিন অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুবিধা হইল না। ক্রমশঃই তপোবিঘ্নকর নানাবিধ বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। কত প্রলোভন তাঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তথাপি বশিষ্ঠদেব অটল অচল। তারা নামের তরবারি ধরিয়া তিনি এ সকল মোহকর প্রলোভনের মূলোচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। তারা নামে যাঁহার হৃদয় ভরা, এ জগতে তাঁহার বিঘ্ন কি সম্ভবপর? ভগবতী এহেন ভক্তের তপে তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তখনও প্রত্যক্ষ দর্শনদানে কৃতার্থ করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে বশিষ্ঠদেব দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—

"যাও বৎস! চীনদেশে করিয়া গমন,
তারা নাম মহা-মন্ত্র করহ সাধন।"

বশিষ্ঠদেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আবার সেই চীনদেশে উপস্থিত হইলেন এবং যথায় সাধকেরা পঞ্চমকার লইয়া সাধনা করিতেছেন—তথায় গমন করিলেন। তখনও বশিষ্ঠের মন তাঁহাদের সেই পূজার পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। সে সময়েও যেন তাঁহার মনে সেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণার উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় তিনি পুনরায় শুনিতে পাইলেন, কে যেন কাণে কাণে বলিতেছে—

"শুন বৎস! স্থির হও দৃঢ় কর চিত্ত,
অচিরে পাইবে যাহা মনের বাঞ্ছিত।"

বশিষ্ঠ করযোড়ে প্রণাম করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং কোথায় কি ভাবে তারাপূজা করিবেন—তাহাই ভাবিতে

লাগিলেন। পরিশেষে মনে মনে স্থির করিলেন, নদীর অপর পারে যথায় অনাদিলিঙ্গ চন্দ্রচূড় শিব আছেন,—তথায় মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিকটে আসন নির্দ্দিষ্ট করতঃ সিদ্ধিলাভ করিবেন।

নদীর পরপারে আসিয়া কিছু কালের মধ্যেই তিনি তারাদেবী ও চন্দ্রচূড়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। সেই হইতে এই স্থান সিদ্ধপীঠ নামে অভিহিত। আজও তথায় তারা মায়ের ও দেবাদিদেব চন্দ্রচূড়ের মন্দির বর্ত্তমান। বহুদেশ হইতে সাধক সকল সময়ে সময়ে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দু-কুল-রাজলক্ষ্মী মহারাণী ভবানীর দ্বারাও এখনও এখানে নিত্য পূজার বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত। কারণ, ইহা তাঁহারই জমিদারী-ভুক্ত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মিথিলা ও অযোধ্যা ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ভদ্রলোক মাত্রেই ঐ দুই স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা করিতেন। বশিষ্ঠদেবও সিদ্ধিলাভের পর তথায় বাস করিতে লাগিলেন। আজও সেখানে তাঁহার যজ্ঞ-কুণ্ড বশিষ্ঠ-কুণ্ড নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। এই সময় তিনি কর্দ্দম-মুনির কন্যা লোকললামভূতা পতিব্রতা অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন এবং রাজা বিশ্বামিত্রের সহিত বিষম বিবাদের সূত্রপাত করিয়া নিজ ব্রহ্মবল অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই বশিষ্ঠদেবই রঘুকুল-তিলক রাজা রামচন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধপীঠের প্রচার।

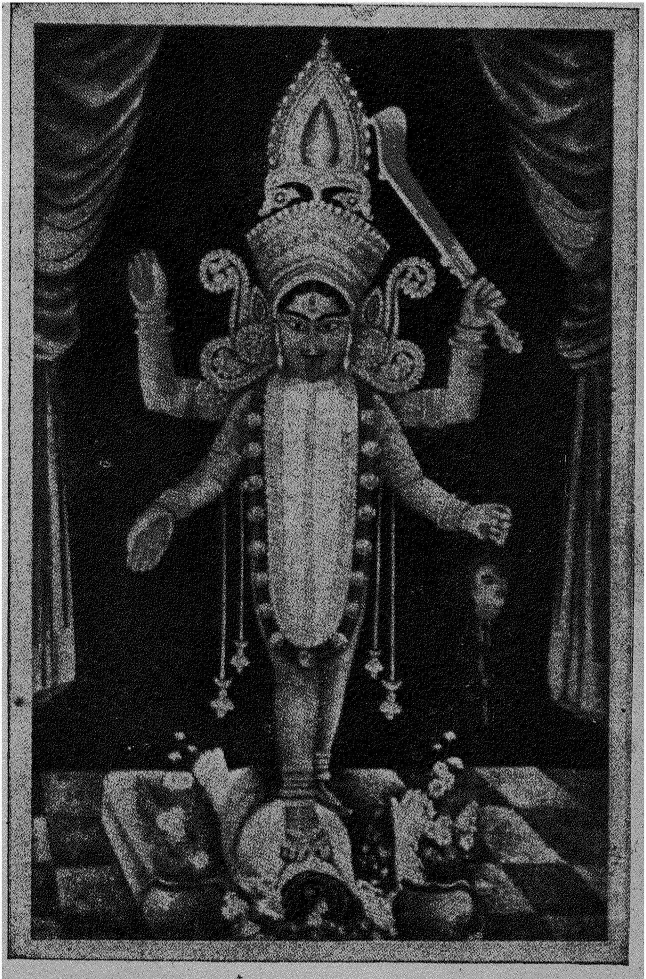
এ জগতে কালের ক্ষমতা অসীম। সেই অনাদি অনন্ত মহাকালের বিচিত্র গতি কে বুঝিতে পারে? বশিষ্ঠদেবের পর কত যুগ অতীত হইয়াছে, কত রাজার রাজত্ব ধ্বংস হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ইতিহাসও তাহার কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না। কোন পুরাণ কাহিনীতেও তাঁহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

পরিবর্ত্তনশীল জগতের গতি অনুসারে এই ভাবে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, রত্নগড়ের প্রসিদ্ধ বণিক জয়দত্ত তারাপীঠের দ্বারকানদীর উন্মত্ত তরঙ্গরঙ্গ বিদারিত করিয়া নানা পণ্য-পরিপূর্ণ নৌকাযোগে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। বালক পুত্রকে নিজ ব্যবসা শিক্ষা দিবার জন্য সঙ্গে রাখিতেন। তখন এ স্থান বাণিজ্য প্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বণিক একদিন বাণিজ্যের আশায় বাটী হইতে বাহির হইয়া এই স্থানে আসিলেন। এখানে আসিয়া পুত্রটী অসুস্থ হইল; কাজেই বণিক তথায় আর থাকিতে পারিলেন না। সত্বর বাটী ফিরিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তারাপীঠের

নিকটে দ্বারকানদীর বন্দরেই পুত্রটী ইহলীলা সম্বরণ করিল। বণিক জন্মদত্ত পুত্রশোকে বড়ই কাতর হইলেন। তিনি সেদিন আর কোথাও যাইতে না পারিয়া তারাপীঠেই অবস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া ইস্ট-আরাধনায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পুত্র-শোক-শেল যাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার মন কি সহজে স্থির হইতে পারে? ইস্টপূজায় তাঁহার মনঃসংযোগ ঘটিল না। বাটী গিয়া মৃত পুত্রের সৎকার সমাধা করিবেন, এই অভিপ্রায়ে শবদেহ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ ইস্টচিন্তার পরিবর্ত্তে অনবরত তাঁহার মনে সেই চিন্তাই সমুদিত হইতে লাগিল। একমাত্র প্রাণের ধনে চির বঞ্চিত হইলেন—আর তাহার পুত্রাদি নাই। হায়! কেমন করিয়া পত্নীকে প্রবোধ দিবেন, ইহাই তাঁহার মহাচিন্তার কারণ হইল।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—মহাশয়! একটা অলৌকিক কাণ্ড দেখিবেন? আসুন। জয়দত্তের প্রাণে বল নাই, মনে সাহস নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি নাই। ভৃত্যের বাক্যে তিনি মন্ত্রচালিত মানবের মত গমন করিয়া একটী পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শোক-দগ্ধ হৃদয়ও কিয়ৎক্ষণের জন্য মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন—পুষ্করিণীর জলে মৃত মৎস্য সকল পুনর্জীবন লাভ করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া তিনি ভৃত্যকে সযত্ন-রক্ষিত পুত্রের শবদেহটী তথায় আনিতে বলিলেন।



৮ তারাপীঠের তারাদেবী।

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে না হইতেই ভৃত্যগণ শবদেহ লইয়া জলে ফেলিয়া দিবা মাত্র পুত্র জীবিত হইয়া উঠিল। বণিক জয়-দত্ত ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—ভগবান্! তোমার অপার মহিমা! আজি কি অসীম করুণা-রাশির অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখাইলে নাথ! ভগবানের আশ্চর্য্য মহিমায় তিনি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আর কোন বাক্য বলিবার ক্ষমতা রহিল না। তিনি ভাবমগ্ন হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে সেই পুষ্করিণীর নাম জীবিত-কুণ্ড রাখা হইল। পুষ্করিণীর নিকট যে জীর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, জয়দত্ত নিজ ব্যয়ে তাহার সংস্কার করিয়া দিলেন। সংস্কার কালে তিনি তন্মধ্যে অনাদি লিঙ্গ মহাদেবের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎপরে তারা মূর্ত্তিও তাহার নয়নগোচর হইল। বশিষ্ঠদেব-প্রতিষ্ঠিত এই সকল মূর্ত্তি সেবা অভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তিনি তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু বণিক পরম বৈষ্ণব, তাঁহার ইচ্ছা—একটী নারায়ণ শিলারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ঐ দিন রজনীযোগে এক মহর্ষির নিকট শুনিলেন যে, এই তারা মূর্ত্তিতেই নারায়ণের পূজা হইবে। কালীকৃষ্ণের সমন্বয়েই সাধক এই মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। কালীকৃষ্ণ পৃথক্ ভাবে ভাবিলে সাধক হওয়া যায় না—এই দুয়ের মধ্যে পৃথক্ কিছুই নাই, কালীই কৃষ্ণ হন, কৃষ্ণই আবার কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন—সাধকের ইচ্ছাতেই এ সকল কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি মহাভাগ্যবান্। বাস্তবিক সাধক সুসিদ্ধ হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে

যা সাজাইবে—তিনি তাই সাজিবেন। ভাবের ঘরে কোন মূর্ত্তি-ভেদ নাই—তাইতো সাধক গাহিয়াছিলেন—"শ্যামা হ'লি মা রাসবিহারী নটবর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে।" আবার আয়ানের ভয়েও তাঁহাকে কালীমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। কুটিলা শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলিয়া গালি দিত। একদিন রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা দেখাইয়া দিয়া আয়ানের রোষ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহাকে বনে পাঠাইয়া দিলেন—শাক্তভক্ত আয়ান ভাবমগ্ন-হৃদয়ে বনে আসিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই শ্রীরাধার মান-রক্ষার্থ ভগবান্ কালীমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। আয়ান সে মূর্ত্তি দেখিয়া গাহিলেন,—"কই রে কুটিলে বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই, শোভে' বনে রাধা সনে এ যে তারা ব্রহ্মময়ই।" অতএব কালীকৃষ্ণ এক। সাধু জয়দত্ত মহর্ষির কথা শুনিয়া ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন। মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সাধু বণিক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করতঃ চন্দ্রচূড় মহাদেব ও তারাদেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া পুত্রসহ গৃহে গমন করিলেন।

জয়দত্তের পর আরও অনেকে এই সিদ্ধপীঠের মহিমা কীর্ত্তন করিতে বিরত হন নাই এবং তারাদেবী ও মহাদেবের পূজার সুবন্দোবস্তও করিয়া দিয়াছিলেন। সে সকল মহাত্মাগণের নাম কোথাও পাওয়া যায় না, পাইবার উপায়ও নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই সিদ্ধপীঠ ও তারামায়ের মন্দির বহু প্রাচীন; সম্প্রতি ইহার প্রতিষ্ঠা কেহ করে নাই।

এককালে যখন রাজসাহীর গৌরব-রবি মধ্যগগনে দীপ্তিমান দিবাকরের ন্যায় ধরায় আপন মহিমা প্রচার করিতেছিল, যখন প্রাতঃস্মরণীয় জমীদারকুল আপনাদের প্রবল প্রতাপে ইহার পবিত্র অঙ্ক সমলঙ্কৃত করিতেছিলেন—সেই সময় তথাকার রাজা উদয়নারায়ণ বীরভূমের কিয়দংশ নিজ জমীদারীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এখন যে স্থানে মায়ের মন্দির অবস্থিত—তাহা এই পরগণা হইতে বেশী দূর নহে। রাজসাহীর অধিপতি উদয়নারায়ণ এড়ালের জমীদার রামজীবনের উপর এই জমীদারীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। রামজীবন অল্পদিনের মধ্যে নিজ পারদর্শিতা গুণে সকলের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধর্ম্মময় ও পরোপকারপরায়ণ ছিল।

জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ভাগ্যও কখন কাহার সমভাবে থাকে না। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রাজসাহীরাজ্যের ভাগ্য-গগন ক্রমশঃ কুয়াশা সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার দারুণ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী করাল বদন বিস্তার করিয়া প্রজাগণকে উদরসাৎ করিতে লাগিল! ধর্ম্মিকপ্রবর রামজীবন প্রজাবর্গের দুরবস্থা দর্শন করিয়া কর আদায়ে বিরত হইলেন।

রাজস্ব প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে, রাজসাহীর অধিপতি উদয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেশের অবস্থা বর্ণন করিলেন, কিন্তু নবাবের কঠিন হিয়া তাহাতে দ্রবীভূত হইল না। তিনি কড়া হুকুম দিয়া বলিলেন—যেরূপে হউক,

কর সংগ্রহ করিতেই হইবে। উদয়নারায়ণ কি করিবেন, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহলে মহলে কর আদায়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নায়েবগণের উপর তজ্জন্য নানাবিধ কড়া হুকুম জারী করিলেন। ইহা শুনিয়া রামজীবন একদিন যৎসামান্য টাকা লইয়া তাঁহাকে হিসাব দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। উদয়নারায়ণ এড়াইলে আসিয়া কিছু টাকা আদায় হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু হিসাব নিকাশের খাতায় ব্যয়ের পারিপাট্য দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—"রামজীবন! এ অবস্থায় তুমি এ-কি করিয়াছ, ইহাতে যে আমার সর্ব্বনাশ হইবে?"

রামজীবন করযোড়ে বলিলেন—প্রভু! আমি আপনার টাকা অপচয় বা অপলাপ করি নাই। যাহা করিয়াছি—আপনি স্বচক্ষে দেখুন। এই বলিয়া তিনি সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। তৎপরে তারাদেবীর মন্দির নিকটে আসিয়া বলিলেন—আপনার টাকায় আমি এই মন্দির সংস্কার করিয়াছি, চন্দ্রচূড় মহেশ্বরের পুনরুদ্ধার করিয়াছি। তখন দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় এবং বঙ্গেশ্বর নবাব বাহাদুর যদিও তাঁহার প্রতি তাদৃশ প্রীতি প্রদর্শন করেন নাই—তথাপি উদয়নারায়ণ রামজীবনের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ধার্ম্মিক প্রবর রাজা তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। সেই অবধি রামজীবনের কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যখন রাজ-সাহীর সর্ব্বময় কর্ত্তা উদয়নারায়ণের অধঃপতন হইল, সেই সময়ে

নাটোরের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হয়। বীরভূমের যে অংশ রাজসাহীর অধীন ছিল, এক্ষণে তাহার কিয়দংশ নাটোরের অধিকারভুক্ত হইল।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী যখন নাটোরের কর্ত্রী, আসাদুল্লা খাঁ তখন বীরভূমের রাজা। তারাপুর তখন তাঁহার অধীনে পড়িয়াছিল। মুসলমান রাজা, হিন্দুর দেবদেবীর পূজার ব্যাপার নিজ রাজত্বে রাখিতে চান না। এই জন্য রাণী ভবানী নিকটবর্ত্তী মৌজা তাঁহাকে প্রদান করিয়া তারাপুর নিজের অধীনে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন এবং রাজ-সরকার হইতে পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত এখানে সুপ্রচলিত থাকিয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব কার্ত্তিমেখলায় বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষট্‌চক্র ভেদ।

ভগবান্‌ সদাশিবের শ্রীমুখনিঃসৃত কলিকলুষনাশন তন্ত্র-শাস্ত্রটীকে কতকগুলি শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপটাচারী ব্যক্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া আজকাল সাধারণ লোকের মনে একটু ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। তাহারা তন্ত্রের কিছুই অবগত নহে, কিছুই বুঝিতে পারে না, অথচ তান্ত্রিক নাম ধারণ করিয়া অযথা তাহার অপব্যবহার করিয়া লোক মজাইতে বসিয়াছে। এইজন্য আজকাল বীরাচারী তান্ত্রিক বা কৌল বলিলে লোকে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাহার কারণ আর কিছু নহে, কেবল বুঝিবার দোষ। যে শাস্ত্র স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর, শঙ্করীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, কলির অল্পায়ু জীবের উদ্ধারার্থ যে উপদেশ তিনি বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কখন ভ্রস্টাচারী, মদ্যপায়ী লম্পটের বোধগম্য হইতে পারে না। অনধিকারীর দ্বারা অযথা ব্যাখাত হইয়াই তন্ত্রশাস্ত্রের এরূপ পরিণতি হইয়াছে। এখন তান্ত্রিক বা কৌল বলিলেই পঞ্চমকারের উপাসক একজন মদ্যপায়ী আচারভ্রষ্ট জীবকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ—উভয় প্রকারেই পঞ্চমকার সাধনা

হইতে পারে—ইহা সাধকের ইচ্ছাধীন। এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের মুখ নিঃসৃত নিবৃত্তিমার্গের পঞ্চমকারের নিগূঢ় তত্ত্ব এই স্থানে প্রদান না করিলে তান্ত্রিক কৌল বা তন্ত্রতত্ত্বের মর্য্যাদার হানি হয়, এইজন্য এই সকল অতি সরল ভাষায় কিছু কিছু বিবৃত করিলাম। ষট্‌চক্র-ভেদ-পরায়ণ সাধক না হইলে এই নিবৃত্তিমার্গের অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের পঞ্চমকার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—তন্ত্রে এই পাঁচটীকে পঞ্চমকার কহে। যে তান্ত্রিক বা কৌল প্রকৃষ্টরূপে এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন—তিনিই প্রকৃত সাধক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। প্রথম মকার—মদ্য। আগমসার গ্রন্থে ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃত ধারা ক্ষরণ হয়, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দে বিভোর হন, তিনিই যথার্থ মদ্য-সাধক। সাধকের দেহাভ্যন্তরে ছয়টী পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়; এই ছয়টী পদ্মে সাধকের দেহ গঠিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি-সমন্বিত সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরে এই সাধন-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে তাহার অমৃতময় গন্ধে দেহ মন পুলকিত হইয়া যায়, ইহাকেই ষট্‌পদ্ম বা ষট্‌চক্র বলা হইয়া থাকে। সাধক মাত্রেরই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। সদ্গুরুর কৃপায় সাধক এইরূপে যোগ-সাধন করিতে পারিলে, সদাই তিনি আনন্দসুধা

পানে বিভোর থাকিতে পারেন। এইরূপে পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়াও সাধক বহু শত বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন এবং মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন হইয়া যায়। মনুষ্য-শরীরের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড আছে, সেই মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী দুই নাড়ী বর্ত্তমান। ঈড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বামভাগে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও তন্মধ্যে ওঁ শব্দায়মান চিত্রিণী নাড়ী আছে। যে সাধক ষট্‌চক্রের সাধনায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন; তিনি অনবরত হৃদয় মধ্যে ঐ ওঁকার নাদ শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

ষট্‌চক্র—ঐ সুষুম্না নাড়ীতেই গ্রথিত গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিম্নে চারি অঙ্গুলি পরিমিত-স্থানে সুষুম্না নাড়ীতে "মূলাধার" পদ্ম গ্রথিত, ইহা পীতবর্ণ চতুর্দ্দল বিশিষ্ট, ইহার চারিদলে তপ্ত-কাঞ্চনের বং শং ষং সং এই চারি বর্ণ আছে। এই পদ্মমধ্যে লিঙ্গাকৃতি শিবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত, তাহার অমৃত নির্গমন স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি বদন-বিস্তার করিয়া বাস করিতেছেন। লিঙ্গমূলে "স্বাধিষ্ঠান" নামক শ্বেতবর্ণ ষড়্‌দলপদ্ম, তাঁহার ছয়দলে বং ভং মং যং রং লং এই ছয় বর্ণ। নাভিমূলে "মণিপুর" নামক রক্তবর্ণ দশদল পদ্ম, তাহার দশদল পর্য্যায়ক্রমে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশবর্ণে শোভিত। হৃদয়ে "অনাহত" নামক ধূম্রবর্ণ দ্বাদশদলপদ্ম। তাহার দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই সকল বর্ণানুরঞ্জিত। কণ্ঠদেশে "বিশুদ্ধ" নামক নীলবর্ণ ষোড়শদল পদ্ম, উহার প্রত্যেক

দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই বর্ণ শোভিত। ভ্রূমধ্যে "আজ্ঞাচক্র" নামক ঈষৎ পীতবর্ণ দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দল হং ক্ষং এই দুই বর্ণবিশিষ্ট। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা বিদ্যমান, তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু, তাহার উপর শঙ্খিনী নাড়ী এবং তাঁহার ঊর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম, তাহার পঞ্চাশৎ দলে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্রমণ্ডল, তাহার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, ইহার মধ্যে পরম শিব অবস্থিতি করিতেছেন। উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক পদ্মেও বীজ বা দেবতা এবং শক্তি বর্ত্তমান আছেন—যথা মূলাধারে লিঙ্গাকৃতি শিব ও কুণ্ডলিনী শক্তি, স্বাধিষ্ঠান পদ্মে বরুণ দেব এবং বারুণী শক্তি, মণিপুর পদ্মে অগ্নি-দেব ও লাকিনী শক্তি, অনাহত পদ্মে বায়ুদেব ও কাকিনীশক্তি, বিশুদ্ধ পদ্মে আকাশ বীজ হং ও শাকিনী শক্তি, আজ্ঞাচক্রে হং ক্ষং বীজ ও হাকিনী শক্তি অবস্থিতা। ক্ষণজন্মা বীরাচারী সাধক এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সকল বীজ ও শক্তিকে প্রসন্ন করতঃ সহস্রারে উপনীত হইতে পারিলেই শিব হইতে পারেন। উহাতে যে অমিয় ধারা ক্ষরিত হয়, তাহাই মদ্য নামে অভিহিত।

এই ষট্‌চক্রভেদ বড়ই কঠিন ব্যাপার, তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ একদিন ঐরূপ মদ খাইয়াই মত্ততা সহকারে গাহিয়াছিলেন ঃ—

"মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥

সুরাপান করিনি রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥

অহর্নিশ থাক বসি, হর-মহিষীর চরণ-তলে।
নৈলে ধর্‌বে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষমবিষয় মদ খাইলে ॥

(১) যন্ত্রভরা মন্ত্রসোঁড়া, অগু ভাসে সেই জলে (২)।
সে যে অকুলতারণ কূলের কারণ,
(৩) কূল ছেড়ো না পরের বোলে ॥

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে ॥

মাতাল হলে (৪) বেতাল পাবে, (৫) বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে, নিদানকালে,
পতিত হবে কূল ছাড়িলে ॥"

প্রসাদ এইরূপ ভাবে মদ খাইতেন। শুনা যায় প্রবৃত্তি-মার্গেও তিনি বিচরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে মত্ত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

তারপর সেদিন তারা মায়ের আদুরে ছেলে "বামাক্ষেপা" ঐ গান গাহিয়া নয়ন জলে ভাসিয়াছিলেন। ক্ষেপা আপন

(১) যন্ত্র—বোতল। (২) জল—সুধাঘটিত কারণ বারি। (৩) কুল—কৌলিন্ত ক্রিয়া-কলাপ। (৪) বেতাল—শিব। (৫) বৈতালী—কালী।

ভাবে বিভোর হইয়া সময়ে সময়ে রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপ ভাবে গাহিতেন।

যিনি এইরূপ ভাবে মদ খাইয়া বিভোর হইতে পারিয়াছেন—তাঁহার পক্ষে কৃত্রিম মদের প্রয়োজন কি অথবা দুই চারি বোতল খাইলেই কি তাঁহার মত্ততা আনয়ন করিতে পারে? বামার কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে অজস্র মদ খাওয়াইয়াও মাতাল করিতে পারে নাই; তিনি অচল অটল ভাবেই সদা বিরাজ করিতেন। সাধনমার্গের অতীব উচ্চসীমায় সমারোহণ না করিলে বাহ্যিক মদ্যপানে এইরূপ অটলভাবে কেহই থাকিতে পারিবে না, দ্রব্যের গুণ তাহাতে প্রবর্ত্তিত হইবেই হইবে। এইরূপ অবস্থায় ক্ষেপা যখন নাদ-স্বরে তারা মাকে প্রাণের কপাট খুলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার দুই নেত্র বহিয়া অনর্গল প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইত। যাঁহারা তাঁহার এই মাতৃ-আবাহন মন্ত্র একবার শ্রবণ করিয়াছেন; তাঁহারাই তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বামার আকার প্রকার, ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে ঠিক বালক বলিয়াই অনুমান হইত; ঠিক যেন তারা-মায়ের আদুরে ছেলে। বামা কেবল মায়ের জন্যই পাগল, মায়ের কোলে যাইবার জন্যই তিনি লালায়িত ছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক ভাবও ঠিক বালকের মত ছিল। কোন প্রকার কপটতা, হিংসা-দ্বেষ-লজ্জা-ভয় প্রভৃতি সেই মহাপুরুষের নিকট স্থান পাইত না। তুমি যে দ্রব্যই তাঁহাকে খাইতে দাও, তিনি তাহা খাইতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিতেন না। কাপড় পরাইয়া দাও, যতক্ষণ

তাহা কোমরে রহিল—ততক্ষণ বামা সাম্বর, খুলিয়া পড়িয়া গেল বামা দিগম্বর ভাবেই অবস্থিত, কোন লজ্জা-সরম নাই। এক কথায় বামা ষড়্‌রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছিলেন।

বালকের যেমন কোন প্রকার বিকার থাকে না, বামারও তদ্রূপ ছিল না। এই বামাকে দেখিলে আমাদের সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের কথাই মনে পড়ে, উভয়ে একশ্রেণীর তান্ত্রিক ছিলেন। তবে রামপ্রসাদ ছিলেন সংসারী, আর বামা—আজন্ম ব্রহ্মচারী, অধিকতর উগ্র-তপা, সংসার-বিরাগী, চির-কুমার মহাকৌল ছিলেন। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া যাঁহারা পঞ্চমকারে সিদ্ধ হইতে পারেন—তাঁহারাই যোগী সাধক, আর যাঁহারা ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে দেবীকে প্রসন্ন করিতে, পারেন—এই কলিতে তাঁহারাই ধন্য; বামা এই শ্রেণীর সাধক ছিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে তন্ত্রের দ্বিতীয় মকার "মাংস" সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে ঃ—

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্;
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

অর্থাৎ মা শব্দে রসনাকে বুঝায়, রসনার অংশ যে বাক্য তাহা রসনার বড়ই প্রিয় বস্তু, যে ব্যক্তি তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে অর্থাৎ বাক্যের সংযম করিতে পারে, সেই পুরুষই মাংসসাধক।

পঞ্চ জননীর মধ্যে গাভী আমাদের জননীস্বরূপা, ইনিই গোমাতা। গো অর্থে ত' জিহ্বাকে বুঝায়; শাস্ত্রে আছে,—

"গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীং।
তমহং কুলিনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥"

(ইতি হঠ-প্রদীপিকা।)

যিনি প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ ও তালুমূলস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধাপান করেন—তিনি কুলিন। গো শব্দে যে জিহ্বা, সেই জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করণের নাম গোমাংস ভক্ষণ; এইরূপ গোমাংস ভক্ষণ মহাপাতক নহে, মহাপাতক নাশক। জিহ্বাকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে জিহ্বার সংযম হয়, জিহ্বার সংযম হইলেই বাক্যের সংযম হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মী পুরুষই যথার্থ মাংস-সাধক। বামা বাল্যকাল হইতেই স্বইচ্ছায় এইরূপ বাক্য-সংযমে যারপরনাই পারদর্শী ছিলেন; পাছে বেশী কথা কহিতে হয়, পাছে লোকে তাঁহাকে নানা প্রকারে বিরক্ত করে,এইজন্য তিনি লোকালয়ে কখন যাইতেন না, কাহারও সহিত বেশী কথা কহিতেন না। অন্যান্য সাধকেরা যেমন ইতস্ততঃ গমন করেন, কেহ আবাহন করিয়া লইয়া যাইলে অনায়াসে যত্র তত্র যাতায়াত করিয়া থাকেন, বামার সে অভ্যাস তত ছিল না—তাহাতে তিনি বিরক্তই হইতেন। তিনি যে কথা কহিতেন, সাধারণ লোকে তাঁহার সে কথাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু যাঁহাদের সে কথা বুঝিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারা সেই শ্রীমুখনিঃসৃত প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিতেন। পঞ্চমবর্ষীয় বালক যে ভাবে কথা কহিয়া থাকে, বামার কথা সেই প্রকারের, তাহাতে কপটতার লেশ মাত্র ছিল না—যেন সরলতা মাখান।

মৎস্য-সাধক সম্বন্ধে দেবাদিদেব শঙ্করের শ্রীমুখাৎ প্রসূত তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন,—

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে দুই মৎস্য বিচরণ করিতেছে অর্থাৎ মেরুদণ্ড পার্শ্বস্থ ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মধ্যে যে রজ ও তমরূপ শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া, হংস মন্ত্রে অজপা জপ হইতেছে, যে ব্যক্তি তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারেন অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা তাহাকে সংযত করতঃ প্রাণকে স্বতঃ স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যসাধক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। চিরকুমার বামাপাগ্‌লা যখন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বা অস্থি-পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, যখন মন-প্রাণকে বাহ্য বিষয় হইতে টানিয়া লইয়া, তন্ময়ভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন; তখন তাঁহাকে দেখিলে শঙ্করের অবতার ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না, তাঁহার গাত্রে সূচী বিদ্ধ করিলেও তাঁহার চৈতন্য হইত না। প্রাণায়াম দ্বারা অনেক মাহাত্মাকে একদিন বা দুইদিন জলমগ্ন হইয়া থাকিতে বা মৃত্তিকা-প্রোথিত হইয়া থাকিতেও দেখা গিয়াছে। বামাচরণ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধন-ভজনের ফলে এ সকল বিষয় বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করিয়াছিলেন, এ সকলের জন্য তাঁহার আর গুরুর নিকট শিক্ষার আবশ্যক হয় নাই।

চতুর্থ মকার মুদ্রা—অর্থাৎ মদের চাট—কড়াই ভাজা, বাদাম ভাজা ইত্যাদি। শাস্ত্রে আছে—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ,
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্।
সূর্য্যকোটীপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলম্,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

শরীরস্থ সহস্রদল কমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত কূটস্থ মধ্যে পারদের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ হইতেও জ্যোতির্ম্ময়, অতীব কোমল এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত যে আত্মা অবস্থিতি রহিয়াছেন, তাঁহাকে যিনি সম্যক্ রূপে অবগত হইয়াছেন—তিনিই মুদ্রাসাধক। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রাণবায়ু-রূপে দেহের মধ্যে বিরাজমানা রহিয়াছেন। রুদ্রযামল গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—"সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।" গুরুর উপদেশে যিনি উত্তমরূপ ক্রিয়ার দ্বারা ঐ পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছেন—মুদ্রাসাধনায় তিনিই যথার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সাধক বামাচরণ তন্ময়তা সহকারে মদের চাট্ করিতে করিতে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। তখন তাঁহার চক্ষের পলক পড়িত না, বোধ হইত যেন তাঁহার আর সংজ্ঞা নাই। বহুক্ষণ পরে আবার তাঁহার পূর্ব্বভাব উপস্থিত হইত। পলকহীন নেত্রে তিনি সমস্ত

দিবস অতিবাহিত করিতে পারিতেন। বালক যেন আশ্চর্য্য হইয়া আপন মনে কি ভাবিতেছেন।

আগমসারে ভগবান মহাদেব পার্ব্বতীকে মৈথুন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—সাধক সেইরূপ ভাবে রমণ করিতে পারিলেই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। ইহা যদি সামান্য বিষয় হইত, পঞ্চমকার যদি তামাসার বিষয় হইত, তাহা হইলে জ্ঞানময় ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব কি আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী, জগতের আধারভূতা জননীর নিকট এ কথা প্রকাশ করিতেন? তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
রেফস্তু কুঙ্কমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারহংসমারুহ্য একতাচ সদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥

এইরূপভাবে মৈথুন করিতে পারিলেই সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শরীরের নাভিচক্রস্থিত কুণ্ড মধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ রকারের সহিত আকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির মধ্যবর্ত্তী বিন্দুরূপ মকারের যখন মিলন হয়, তখনই জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে এইরূপে স্থিতি লাভ করিয়া রমণ করার নাম—রাম। যোগীশ্রেষ্ঠ মহাকবি

বাল্মীকি এইরূপে রমণ করিয়া শ্রীরামের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ক্ষেপা বামা এইরূপে রমণ করিয়া মৈথুনের প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়াছিলেন—তাই তিনি আর বিবাহ করেন নাই। আজন্ম কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কোনও গুরুর নিকট নিয়মিতরূপে যোগশিক্ষা বামাচরণের হয় নাই। আজীবনই ভক্তি-বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। স্থবিরের ন্যায় একস্থানে বসিয়া নানাপ্রকার আসনের অভ্যাসও তিনি করেন নাই। তিনি জানিতেন—বিশ্বের ঈশ্বরী মা আছেন, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়। যখন আবশ্যক হইত, তখন তিনি প্রাণপণে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ভক্তি-বিশ্বাসের বাঁধা সুরে "তারা" বলিয়া এমন চীৎকার করিতেন, যাহাতে তাঁহার দুনয়ন প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া যাইত। যে সেখানে থাকিয়া ক্ষেপার এ ক্ষেপামী দেখিত, সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

যাহার জীবন-নদে ভক্তি বিশ্বাসের বাণ ডাকে—পলি পড়িয়া যাহার হৃদয়-ক্ষেত্র উর্ব্বরতাময় হয়, সেখানে সাধন-বীজ যে আপনা আপনি অঙ্কুরিত হইবে,ইহার আর বিচিত্রতা কি? অতিরিক্ত শিক্ষায় বরং সময়ে সময়ে নাস্তিকতা আসে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হইলে সাধন-ভজনে আর কোনও গোলযোগ থাকে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৌলিক-প্রথা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে—তাহা সাত্ত্বিক পঞ্চমকার, শাস্ত্রে ইহার বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর এক্ষণে তামসিক পঞ্চমকারের প্রচলন করিয়া তান্ত্রিক সাধকগণ তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই তামসিক আচারে অনেক সময়ে বিষময় ফলও লাভ হইয়া থাকে। যাহারা আজন্ম উন্মার্গগামী; মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য, মৈথুন প্রভৃতি যাহারা অযথাভাবে অভ্যাস করে—তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। অনুকল্প ভাবে শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা পরে বলিতেছি। অনেক তান্ত্রিকে বলেন—যাহারা কখন ভগবানের নাম করে না, ভগবানের নাম করিতে যাহাদের রসনা জড়ভাব প্রাপ্ত হয়; প্রকাশ্য অধর্ম্মাচরণ করিয়া যাহারা জীবন কলুষিত করিতেছে; নানাবিধ পাপকার্য্য যাহাদের অঙ্গের আভরণস্বরূপ, তাহাদিগকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, ভগবানের নামে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য এরূপ করায় দোষ নাই। আমরা তাঁহাদের এ কথার অনুমোদন করিতে পারি না। অনেক ব্যভিচারগ্রস্ত পাষণ্ড এইরূপ প্রলোভনে ভুলিয়া শেষ-জীবনে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইহার শত শত প্রমাণ চক্ষের সম্মুখে

বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রকাশ্যে অনাচার বা মদ্যপান করা অপেক্ষা তন্ত্র-শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী মদ্যপান করিলে পাপাচারের অনেক লাঘব হয়। সার্ব্বজনীন তন্ত্রশাস্ত্র দুর্বৃত্তদিগকে সাধন-পথের পথিক করিবার জন্য এরূপ বিধানও করিয়া দিয়াছেন। ইয়ার-বন্ধুর সহিত প্রকাশ্যভাবে যথায় তথায় মদ্যপান না করিয়া নির্জ্জনে একাকী মদ্যপান করিলে নিশ্চয়ই পানের মাত্রা কম হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলিদানের ব্যাপারও ঐরূপ। জীবহিংসা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। তুমি শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য বৈষ্ণব—যাহাই হও, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না হইলে তোমার কিছুতেই ভগবানের করুণা লাভ হইবে না। বলিদানের প্রকৃত ভাব—রিপু বলি; দেবদেবীর নিকট ষড়্‌রিপু বলিদান দেওয়াই প্রকৃত সাধকের লক্ষণ; কিন্তু সেরূপ সাধক ত' আর সকলেই হইতে পারে না। এইজন্য দেবীর নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি প্রদান করিলে হিংসাবৃত্তি অনেক পরিমাণে কম হইবে, অযথা পশু-হননেও লোকের তাদৃশ প্রবৃত্তি থাকিবে না। এইজন্য এই শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক-ভাব সাধারণ অধিকারীর অভ্যস্থ হইবার জন্য ঐরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। একেবারে সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে বলিলে প্রবৃত্তিমার্গের লোক কোনক্রমেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে না। প্রত্যহ কসাইয়ের দোকানে কত শত পশু-হনন হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই কিন্তু দেবোদ্দেশে কি তাহা অপেক্ষা অল্প হইতেছে না? লোকে ত' মান্‌সিক করিয়া ঐরূপ বলি প্রদান করে, এরূপ ধর্ম্মের ভাণও ভাল। তারপর যখন

তাঁহারা সদ্‌গুরু লাভ করিবেন বা সৎ উপদেষ্টার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিবেন, তখন স্বতঃই তাঁহাদের চৈতন্য হইবে—তাঁহারা রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিবর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক ভাবের অধিকারী হইবেন। হংস যেমন জলীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের ভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সাধক তখন "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" জ্ঞানে জীবহিংসা পরিত্যাগ করিতে পারিবে। তখন দুধ মরিয়া ক্ষীর হইয়া যাইবে। তান্ত্রিকগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলেন—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে,
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

যাঁহারা সৎ-সাধক, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, ভগবানের দয়া যাঁহাদের প্রতি সমধিক—তাঁহারা "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" শেষের এই মহাবাক্য কয়টীর দ্বারা সমস্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা সৎ তাঁহারা ত' সৎ আছেনই এবং সৎই থাকিবেন। অসৎকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এই নিয়ম, এই শ্রেণীর তান্ত্রিক সাধকগণের উক্তির পক্ষে মতামত প্রদান না করিয়া আমরা ক্ষেপার মুখে যাহা শুনিয়াছি, যাহা শাস্ত্রে সামান্য অধিকারীর পক্ষে অনুকল্প ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা সাধ্যমত পরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে পাঠক আসুন, আমরা আমাদের প্রকৃত পন্থা অনুসরণে যত্নবান হই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে তারাপীঠে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। তাঁহারা অহোরাত্র দেবীর ধ্যানে নিরত থাকিয়া

সিদ্ধিলাভ করিতে যত্নবান হইতেন এবং পূজান্তে তারাদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল সিদ্ধপুরুষ-গণের মধ্যে আনন্দনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায় সকল পুস্তকই অধ্যয়ন করিয়া অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। নাটোর রাজবংশের সহৃদয় রাজা, সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ সময়ে সময়ে আনন্দনাথের সহিত শাস্ত্রালাপ ও সাধন-মার্গের উপদেশ সকল আলোচনা করিয়া পরম আপ্যায়িত হইতেন। আনন্দনাথ তন্ত্রশাস্ত্রের মত প্রচলন করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং সেই সময় তথায় যে সকল মহাত্মার শুভাগমন হইত, তাঁহাদিগকে তিনি তান্ত্রিক মতে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, পূজার ক্রম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দান করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে লোকসমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনিই তারাপীঠের প্রধান কৌলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম তারাপুরে প্রধান কৌলের পদ সৃষ্টি হয়। রাজা রামকৃষ্ণ আনন্দনাথকে সাধন বিষয়ে বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার ভজনের নিয়ম প্রণালী দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারই উপর মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও দেবীপূজার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে নাটোর রাজসরকার দেবীর নিত্যপূজার ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

আনন্দনাথ তারাপুরে শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে যে চিরবিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, আনন্দনাথ তাহার মীমাংসা করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে এক করিয়া গিয়াছেন। এক তারাপুর ভিন্ন শাক্ত-বৈষ্ণবের একত্র সম্মিলন আর কোন তীর্থক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। ১১৬১ সালে আনন্দনাথ ভবলীলা শেষ করিলে তাঁহার প্রধান ও প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ মোক্ষদানন্দ তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। মোক্ষদানন্দের বাটী তারাপুর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী রাৎমা গ্রামে অবস্থিত ছিল—ইহাই তাঁহার জন্মস্থান। ইঁহার প্রকৃত নাম মাণিকরাম, কিন্তু শাক্তাভিষেকের পর হইতে তিনি মোক্ষদানন্দ নামেই সাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বাল্যকালে ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে করিতে কুসংসর্গে পড়িয়া সমস্ত নষ্ট করেন এবং জীবনে প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সমাজ যখন জানিতে পারিলেন যে তিনি বিবাহিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে, তাঁহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মোক্ষদানন্দ এইরূপে নিরুপায় হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করতঃ অবশেষে তারাপুরে আসিয়া আনন্দনাথের শিষ্য হইলেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর প্রধান কৌলিকের পদ লাভ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—মোক্ষদানন্দ স্থানীয় লোক, এই জন্য

তিনি এই স্থানের রীতি-নীতি, সমাজ-পদ্ধতি, দোষ-গুণ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। একান্তমনে তিনি তথাকার লোক সকলের উন্নতিকল্পে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, বালকগণকে বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিতে হইবে ? আপনাপন গুরুজনের পূজা ও সেবা করিতে শিখিতে হইবে, কঠিন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে হইবে, বাবুগিরির নামমাত্র কেহ করিতে পাইবে না এবং সময় পাইলে অভিভাবকগণের সহিত এক একবার তারাপুরে আগমন করিয়া তারা-মায়ের পূজায় ব্রতী হইবে। অচিরকাল মধ্যে মোক্ষদানন্দের এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল ; তাঁহার আজ্ঞা সকলেই অবনতমস্তকে পালন করিয়াছিল। এই পদে অবস্থিত থাকিয়া তিনি আপন কার্য্য পরিসমাপ্তি করতঃ কিছুদিন পরে স্বর্গারোহণ করিলে, আমাদের পূজনীয় বামাচরণ তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। এই বামাচরণই অবশেষে "বামাক্ষেপা" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহারই পবিত্র চরিত্র বর্ণিত হইতেছে।

বামাক্ষেপার ন্যায় ত্যাগী, বিশ্বাসী ভক্তিমান্ মহাপুরুষ সম্প্রতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বামা—নামের প্রত্যাশী ছিলেন না বলিয়া দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহাকে জানিত না কিন্তু যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছে, সে তাঁহাকে পরম যোগী, সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া তাঁহার চরণে গড়াগড়ি দিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মাতৃ বিয়োগ।

বীরভূম জেলা বাঙ্গালার ইতিহাসে অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জেলা। এক সময়ে দেশের অধিকাংশ সাধক, ভক্ত, কবি, শিল্পী, গায়ক প্রভৃতি মহাত্মারা এই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া, জেলার পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রধান শাখা—শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় এখানে যথেস্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে প্রতিপত্তি এখনও এখানে সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান আছে। হিন্দুর একান্নটী মহাপীঠের মধ্যে পাঁচটী এই বীবভূম জেলাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠ যে এ জেলায় কত আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এই জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে কত অনাদিলিঙ্গ শিবের পূজা হইতেছে—দেখিতে পাইবেন। কালীপূজা ও দুর্গাপূজা এই জেলার গ্রামে গ্রামে সমাহিত হইয়া থাকে। শাক্তগণের আচার ব্যবহারের নাম বীরাচার, বীরাচারিগণের আবাসভূমি বলিয়াই এই স্থানের নাম বীরভূমি হইয়াছে এবং এই জন্যই ইহার এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। এই ত’ গেল শাক্তগণের কথা। হিন্দুধর্ম্মের অপর শাখা বৈষ্ণবধর্ম্ম। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু।

এই নিত্যানন্দের জন্মস্থান তারাপুরের নিকটবর্ত্তী বীরচন্দ্রপুর গ্রামে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রাধান্য এ জেলায় যেমন আছে, এরূপ কোথাও নাই। দোল-দুর্গোৎসব সমানভাবে সমাহিত দেখিতে হইলে, বীরভূম জেলার ন্যায় বাঙ্গলা দেশে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। সংস্কৃত সাহিত্যসেবক, আদর্শ বৈষ্ণব-গ্রন্থ "গীতগোবিন্দ" রচয়িতা বৈষ্ণবপ্রবর মহাত্মা জয়দেব গোস্বামী এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ অধিবাসী। বঙ্গভাষার আদিকবি শ্রীমৎ চণ্ডীদাসের নিবাসও এই পবিত্র জেলায় অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, রাজনীতি বিশারদ মহারাজা নন্দকুমার ও সিরাজ-উদ্দৌলার সমসাময়িক আসাদুল্লা খাঁও এই জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর এই জেলার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল—তারাদাস "বামাক্ষেপাকে" অঙ্কে ধারণ করিয়া, বামার পবিত্র পাদস্পর্শে ইহার প্রতি রেণু পবিত্রাদপি পবিত্র হইয়াছে। রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন, তারামায়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র তারাপীঠ এবং স্বর্গীয় বামাচরণের জন্মস্থান বলিয়া এই জেলা হিন্দুর নিকট এক মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত, একথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বামাচরণ দ্বাদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া তারামায়ের পাদপদ্মে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী জননীর বর্ত্তমান সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে গৃহেও গমন করিতেন। বামাচরণ শাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং মূর্খ হইলেও তাঁহার ভক্তিপ্রাবল্য দেখিয়া মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন,

কালে যে তিনি একজন মহাপুরুষ হইতে পারিবেন—মোক্ষদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহাকে প্রধান চেলা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। মোক্ষদানন্দের মৃত্যুর পর বামাচরণ প্রধান কৌলের পদে অভিষিক্ত হইলেও তাঁহার বয়স অল্প ও সাংসারিক কার্য্য পরিচালনে অনভিজ্ঞ বলিয়া তারাপূজার যাবতীয় ভার রাজকর্ম্মচারীবর্গই গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বামাচরণ এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। এ সকল কার্য্য কি তাহার ন্যায় নির্লিপ্ত যোগীর পক্ষে শোভা পায়? তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য তারা আরাধনা। তিনি সর্ব্বদাই "তারা" "তারা" বলিয়া চীৎকার করিতেন। ভক্তির উৎসে ও হৃদয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসে নাম-সাধনায় সিদ্ধ বামার মুখে যিনি এই "তারা" নাম শুনিয়াছেন—তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি —অতি শৈশবে বামাচরণ পিতৃহীন হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর, যখন তিনি তারাপীঠের মহান্তরূপে সেই সিদ্ধপীঠে অধিষ্ঠিত, তখন একদিন হঠাৎ তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আপনমনে দ্বারকা নদীতে স্নান করিতেছেন; এমন সময় তিনি হরিধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার জননীর মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য তারাপুরের শ্মশানে আনীত হইয়াছে। বামাচরণ তাহাদিগকে দেখিয়াই সমস্ত বুঝিলেন, পাগল বামাচরণ "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ধন্য মাতৃশোক! তুমি যোগীই হও, আর আজন্ম সংসারবিরাগী জিতেন্দ্রিয়ই হও, মাতৃশোক-শেল

তোমায় অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিবেই করিবে। পার্থিব দেব-দেবী জনক-জননীর মহাপ্রস্থানে হৃদয়ে শোকাবেগ হয় না—এমন লোক জগতে নিতান্তই বিরল। বামাচরণের ক্রন্দন শুনিয়া অপর পার হইতে সকলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা মাতৃদেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য চিতা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। বামাচরণের ইচ্ছা, নদীর এই পারে অর্থাৎ যেদিকে তারাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত, সেই পারের শ্মশানে তাঁহার জননীর পবিত্র দেহ অগ্নিদগ্ধ করিবেন। কিন্তু নদীতে বন্যা আসিয়াছে; স্রোত এত প্রবল যে কিছুতেই পার হওয়া যায় না। পাগল বামা উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই খরস্রোতে গা-ভাসন দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"তারা মা! আমার মা যেন তোর তীরে স্থান পায়।" ভক্তি ও বিশ্বাসের একনিষ্ঠ সাধক, তারাগত প্রাণ, ভক্তচূড়ামণি বামাচরণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। তীরস্থিত জনসঙ্ঘ সকলে বলিতে লাগিল—পাগ্‌লা বুঝি আর বাঁচিল না—ঐ দেখ প্রখর স্রোত তাহাকে টানিয়া লইয়া কোথায় ফেলিয়া দিল—হায়, হায়! কি হইল, ক্ষেপা জন্মের মত ডুবিয়া মরিল।

নদী প্রবলবেগে তরঙ্গ তুলিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে—সে কাহারও কথা শুনিবে না—কোন বাধা মানিবে না। সাধক বামাচরণ, সেই প্রবল স্রোতে—তারানামের তরী আরোহণ করতঃ গোষ্পদের ন্যায় নদী পার হইয়া অপর পারে উঠিলেন এবং জননীর মৃতদেহ পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া পুনরায় সেই স্রোতে

দেহতরী ভাসাইয়া দিলেন। লোকে কত নিষেধ করিল কিন্তু পাগল কাহার কথা শুনিল না। কেবল চীৎকার করিয়া বলিল—"আমার মায়ের সৎকার এ তীরে হইবে না।" এই বলিয়া সন্তরণ দিতে লাগিল। মাতৃভক্তের নিকট এ কার্য্য কিছু বেশী কঠিন নহে। একদিন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মাতৃচরণ দর্শন মানসে দামোদর নদের প্রবল বন্যা সন্তরণে পার হইয়াছিলেন। ভক্তের নিকট বিশেষতঃ ঈশ্বর বিশ্বাসী মহাপুরুষগণের নিকট অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, অসাধ্যও সুসাধ্য হইতে পারে। তারামায়ের প্রিয় পুত্র বামাচরণের নিকট এ কার্য্য যে অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি।

বামাচরণের জননীর পাঞ্চভৌতিক দেহের সৎকার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। তারাদেবীর সাক্ষাতে এরূপ ভাবে সৎকার কয়জন জননীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; কয়জন জননীর পুত্রই বা এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পারে? এইজন্যই লোকে সৎপুত্রের পিতামাতা হইবার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা করে। বামাক্ষেপার ন্যায় পুত্রকে যিনি উদরে ধারণ করিয়াছেন—তিনি রত্নগর্ভা; মৃত্যু সময়ে তাঁহার যে এরূপ সদ্গতি লাভ হইবে, সে বিষয়ে কি কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? ভক্তি-বিশ্বাসের অকপট যোগী বামাচরণের শৌচাশৌচ জ্ঞান ছিল না। জননীর স্বর্গারোহণের পর অশৌচ অবস্থাতেও তিনি গৃহে অবস্থান না করিয়া, বিশ্বজননী মায়ের নিকট শ্মশানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

বামাচরণের ন্যায় শুদ্ধাত্মা সাধকের নিকট আবার বাহ্যিক শুচি-অশুচি কি? বামাচরণের বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ অনেক প্রকারে অশুচি হইলেও অন্তর তাঁহার পবিত্র ছিল, তাই ত' তাঁহার হৃদয়াসনে কৈলাসেশ্বরীর পবিত্র আসন বদ্ধমূল হইয়াছিল।

মাতৃ-শ্রাদ্ধের আর তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। পাগল একদিন বাটী গমন করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচরণকে ডাকিয়া বলিলেন—পরশু ত' মায়ের শ্রাদ্ধ তুমি এক কাজ কর, সম্মুখের এই পতিত জমীটুকু পরিষ্কার করাইও, নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতখানি গ্রামের লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিও।

রামচরণ জ্যেষ্ঠের কথায় তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিলেন না; পাগলের খেয়াল মনে করিয়া বলিলেন—দাদা! এ কয়দিন আমাদের হবিষ্যই বহু কষ্টে চলিতেছে। আর তুমি কি না বলিতেছ, পাঁচ সাতখানি গ্রামে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস ও সম্মুখের ময়দানটী পরিষ্কার করিয়া রাখিও—দাদা! এ কি কখন সম্ভব হইতে পারে, আমাদের মত গরীব লোকের কি কখন ওরূপ আশা করা উচিত, বামনের চাঁদ ধরিতে যাওয়া কখন কি শোভা পায়? রামচরণ ত' জানে না যে বামার ক্ষমতা অসীম, ইচ্ছা করিলে এসব কার্য্য অবলীলাক্রমে সমাধা করিতে পারেন!

বামাচরণ দেখিলেন—রামচরণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন আর তাহাকে কোন কথা না বলিয়া নিজেই সমস্ত করিলেন এবং কার্য্য শেষে পুনরায় শ্মশানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ভারে ভারে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল বামাচরণের গৃহে আসিতে লাগিল। তখন রামচরণ দেখিয়া অবাক্ হইলেন। জানি না—সাধকের কোন্ সাধনা বলে, কাহার কুহকমন্ত্রে এই সকল রাজভোগ তাহার পর্ণকুটীরে অজস্র পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচরণ অশৌচান্তে শ্রাদ্ধের দিন প্রফুল্লমনে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ক্রমেই সমবেত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই বামাচরণকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। সেদিন জননীর সৎকার সময়ে বামাচরণের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ক্ষেপার প্রতি অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং সকলে একে একে বামাচরণের বাটীতে শুভাগমন করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য লোকের এত আগ্রহ, এত কষ্ট-স্বীকার, সে কই ; কোথায় সেই মহাপুরুষ ? বামাচরণ সেই যে গিয়াছেন, আর দেখা নাই। তখন তিনি তারাপীঠের শ্মশানে আপন ভাবে বিভোর।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত, আহারীয় দ্রব্যও সমস্ত প্রস্তুত। বেলা অনেক হইয়াছে ; রামচরণ আর দাদার আগমনের অপেক্ষা না করিয়া সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণগণ সবেমাত্র আহারে বসিয়াছেন, এমন সময়ে বর্ষাকালের আকাশ

ঘোর মেঘাড়ম্বরে গর্জ্জন করিয়া আসিল। আকাশের ভাব দেখিয়া রামচরণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তিনি করযোড়ে ভগবানের নিকট বলিতে লাগিলেন—ভগবান্! এই অভুক্ত ব্রাহ্মণসকল সবেমাত্র আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় যদি বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে এই অনাচ্ছাদিত স্থানে আর তাঁহারা বসিতে পারিবেন না, অতৃপ্ত অবস্থায় উঠিয়া যাইলে জননীর আমার সদ্গতি হইবার পরিবর্ত্তে অসদ্গতি হইবে—এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে বামাচরণ শ্মশানে বসিয়া মেঘাড়ম্বর দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন। বৃষ্টিপতনের পূর্ব্বেই তিনি গৃহে আসিয়া যথায় ব্রাহ্মণ-ভোজন, সেই প্রাঙ্গণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া রামচরণ তাঁহার পদতলে পড়িয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন —দাদা! তুমি সমস্ত করিলে কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যদি এইস্থানে কোন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে তাহা হইলে আর এই বিপদ হইত না। বৃষ্টি আস্‌বার ত' আর দেরী নাই; তবে কি হইবে দাদা, ইহাদের কি আর ভোজন হইবে না? বামাচরণ বলিলেন —তারামায়ের ইচ্ছায় আমার মায়ের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনে বিঘ্ন হইতে পারে? তুমি স্থির হও। এই বলিয়া বামাক্ষেপা একগাছি কঞ্চি কুড়াইয়া সেই অনাবৃত প্রাঙ্গণ বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তারা নাম জপ করিতে করিতে গণ্ডী দিয়া আসিলেন। জানি না সে সাধকের তারামন্ত্রপূত গণ্ডীর কি অপূর্ব্ব মহিমা! কয়েক মিনিট পরে মুষলধারায় বারিপাত হইল কিন্তু বামার প্রদত্ত গণ্ডীর মধ্যে

এক বিন্দুও বারিপাত হইল না। নির্ব্বিঘ্নে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেল। সকলে সাধকের সাধন-বল দেখিয়া যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই ঘটনাটী কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারেও বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—বামাচরণ সেদিন গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্বয়ংই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। হতাশ প্রাণে আকাশের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—তারা! তুই কি বিঘ্ন বিনাশে অসমর্থ হইয়াছিস্? অথবা তুই পাষাণ বাপের মান রাখিবার জন্য পাষাণী সাজিয়াছিস্? তারা! আমাদের এ বিপদ কি নষ্ট হইবে না মা? বামার করুণ-ক্রন্দন করুণাময়ীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশ সহসা মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া পরিষ্কার ভাব ধারণ করিল। আকাশের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী অতীব বিস্মিত হইয়া গেল। দেবীর কৃপায় সেদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনে আর কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় নাই।

জননীর পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর বামাচরণ সেইদিনই তারাপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট হইয়া তারা নাম জপ করিতে লাগিলেন। "জপাৎ সিদ্ধিঃ" বামা বলিতেন—জপের তুল্য সত্বর সিদ্ধিলাভের আর অন্য উপায় নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব যে আসনে বসিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই সেই আসন। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে প্রকৃত সাধু না হইলে কেহ বসিতে বা বসিয়া থাকিতে পারে না। বামার ভক্তগণ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বসিতে জানা চাই। আসনের যথায় তথায় বসিলে চলিবে না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটিবে। আসন মধ্যস্থিত মুণ্ডের মস্তকে সহস্রার পদ্ম আছে, সেই পদ্মের সহিত সাধকের গুহ্যস্থিত মূলাধার পদ্মের সংযোগ করিয়া বসিতে পারিলেই আর কোন ভয় থাকে না; যে শালারা সে সব জানে না; তারা ত' নষ্ট হবেই।

নদীর ধারে এই আসনের নিকট একটী শাল্মলী তরু অবস্থিত ছিল। নিকটে পঞ্চবটীর বন ছিল; কিন্তু এক্ষণে বহুদিনের পর সেই শিমূলবৃক্ষটী কালের কুঠারাঘাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক স্থানটী এত মনোরম ও শান্তিপ্রদ ছিল যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র লোকের মনে কেমন এক প্রকার ভক্তি রসের আবির্ভাব হইত। আমরা গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি—সে স্থানটী নয়নগোচর করিলে অতি বড় পাষাণ্ড, ভক্তিহীনের হৃদয়ও ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পড়িত। এখন যদিও তাদৃশ নয়ন-মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব হইয়াছে, তথাপি সেই গভীর শ্মশানের গভীরতা, তাহার নশ্বরত্ব-ব্যঞ্জক ভীমভাব দর্শন করিলে মনে স্বতঃই একটা উদাসভাবের আবির্ভাব হয়, স্বভাবতঃই যেন মন ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হয়। তারপর কেহ যদি সেই আজন্মত্যাগী, চিরকুমার, বীরাচারী, প্রকট-কৌল বামার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারে—তাহা হইলে ত' কথাই নাই। তাঁহার কোমল ও কঠিনতাময় আকৃতি দেখিলে কেহ স্থির থাকিতে পারিবে না; স্বইচ্ছায় তাঁহার রাজীবচরণের

ধূলিকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করিবে। বামাকে দেখিলে প্রথমে অতিশয় কঠিন, নির্ম্মম বলিয়া বোধ হইত, সেই ভীমভাবপূর্ণ বিশাল নগ্নমূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় বাস্তবিকই ভয়াকুল হইত কিন্তু যিনি সাহসে ভর করিয়া তাঁহার সহিত একবার কথা কহিয়াছেন, আলাপ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে এরূপ কঠিনতার ভিতর এত কোমলতা কোথা হইতে আসিল ? স্বভাব যেন কোমলতার আধার ; বামা যেন দয়ার অবতার। যে স্থলে বামা বসিয়া থাকিতেন—তাহার চিত্র আমরা স্থানান্তরে প্রদান করিলাম, পাঠকগণ তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

হৃদয় যার মা নামে ভরা, মাতৃপ্রেমে যিনি সদাই বিভোর, মা ছাড়া যিনি জগতে অন্য কিছু জানেন না ; ভক্তি ও বিশ্বাস যাঁহার আরাধ্যতম বস্তু, তিনি কি কখন নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে পারেন ? তবে বাহ্যিক একটু রুক্ষ-স্বভাব না দেখাইলে তাঁহাকে পদে পদে বাধা পাইতে হইবে বলিয়া তিনি সদাসর্ব্বদা ঐরূপ রুক্ষ-ভাব দেখাইতেন। তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর বাহ্যিক ভাব সহসা দর্শন করিলে এইরূপ বলিয়াই বোধ হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বামার লাঞ্ছনা।

তারাপীঠের এই আসনে সর্ব্বপ্রথমে নাটোরের সাধক-প্রধান রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে আনন্দনাথ ও মোক্ষদানন্দ, তারপর বামাচরণ। এক্ষণে এই আসনে বসিবার উপযুক্ত লোক আর এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ জগতে শত্রু কাহার নাই? তুমি সাধু হও, সন্ন্যাসী হও জ্ঞানী বা যোগী হও—স্বার্থান্ধ মানব তোমার দ্বারা কোন উপকার না পাইলে বা স্বার্থের হানি হইলে, তোমার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। প্রকৃতি সকলের সমান নয়, সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি সমান নয় বলিয়া প্রকৃতিগত নানা প্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বামাচরণের যশোরাশি যখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধন-ভজন দেখিবার জন্য নানা দিক্‌দেশ হইতে যখন তারাপুরে শত শত লোকের সমাগম হইতে লাগিল, তখন কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক এই সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী মহাপুরুষকে কোয়াসাজালে বেষ্টিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে বামাচরণকে চরিত্রহীন, অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—বামাচরণ ঠিক বালক-স্বভাব-বিশিষ্ট, তাঁহার শুচি অশুচি ভেদাভেদ ছিল না। শুচি হইলে মায়ের নাম জপ করিতে পারা যায়, আর অশুচি হইয়া জপ করিতে পারা যায় না—তাহা তিনি বুঝিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনাচারীও দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি সময়ে সময়ে এমন সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন যে, তাঁহার আদৌ বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। সমাধি শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ তাহার দেহ অবসন্ন থাকিত। তিনি অনেক সময় জড়ভাবে বসিয়া থাকিতেন, শৌচ-প্রস্রাবে ঘৃণা ছিল না। একদিন বামা ঐ ভাবে বসিয়া আছেন। যেন স্নেহময়ী মায়ের কোলে শিশু পুত্র অবস্থিত; যেন মায়ের চির শান্তিময় ক্রোড়ে বালক শান্তিসুখে ক্রীড়া করিতেছেন; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। ইত্যবসরে কতক-গুলি দুষ্ট লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং দেখিল বামা সেই পবিত্র স্থানে প্রস্রাব করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে অনাচারী, পাষণ্ড মায়ের পবিত্র মন্দির-চত্বরে প্রস্রাব করিল বলিয়া, অকথ্য ভাষায় গালিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং রাজার কর্ম্মচারীবর্গের নিকট গিয়া পাগলের পাগলামীর কথা, মন্দির-প্রাঙ্গণ অপবিত্র করিবার কথা বলিয়া দিল। কর্ম্মচারী-গণ অগ্র পশ্চাৎ কোন বিবেচনা না করিয়া বামাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে প্রসাদ পাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। সুতরাং বামাচরণ পাষণ্ডগণের অত্যাচারে কয়েকদিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইলেন। বামা ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেন; দৈনিক আহার

বন্ধ হইল—তথাপি দৃক্‌পাত নাই; আহার করিয়াও তিনি যে সুখ পাইতেন, আহার না করিয়াও তিনি সেই সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। দেহের কোন মালিন্য নাই; মুখে সেই সরলতা, সেই সরল মধুর হাসি; বামা অচল অটল, প্রকৃতির কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইল না, "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" পরীক্ষাই সকল উন্নতির মূল কারণ; যাহারা অজস্র কষ্ট, অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপন চরিত্র ঠিক রাখিতে পারেন, তাহারই ত' উত্তম পুরুষ। শাস্ত্র বলিতেছেন—

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং॥
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনশ্চারুগন্ধং।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি-বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাম্॥

ইক্ষুদণ্ডকে যতই কোন খণ্ড খণ্ড কর না, তাহার মিষ্টতা যেমন কিছুতেই যায় না; স্বর্ণকে যতবারই অগ্নিদগ্ধ কর না কেন, তাহার বর্ণ যেমন মলিন না হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর চাকচিক্যশালী হইয়া থাকে এবং চন্দন কাষ্ঠকে যতই ঘর্ষণ কর না কেন তাহার মনোহর চারুগন্ধ যেমন কিছুতেই নষ্ট হয় না; সেইরূপ প্রকৃত সাধু পুরুষদের প্রাণান্ত হইলেও তাহাদের প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। সাধক বামাচরণেরও তাহা হইল না, তিনি অনাহার-ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না। অনবরত "তারা" "তারা" বলিয়া অনাহারজনিত যাবতীয় যাতনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। সামান্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ক্লেশ কি বিশ্বাস ও ভক্তির

একনিষ্ঠ সাধক পাগল বামার চিত্ত-চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে? যে একবার অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সামান্য ক্ষুধা তৃষ্ণা কি তাহার ন্যায় যোগী পুরুষকে কাতর করিতে পারে? কর্ম্মচারীগণের অবিমৃষ্যকারীতা দোষে লোকচক্ষে একজন মাতৃভক্ত পরমজ্ঞানী সাধকের নির্য্যাতনের একশেষ হইতে লাগিল।

বামাচরণ আজ চারিদিন উপবাসী, বিন্দুমাত্র অন্নজল তাহার উদরস্থ হয় নাই। এই কথা শুনিয়া তখন কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল—কলিতে সাধু-সন্ন্যাসীদের এরূপ কষ্টই হইবে; কেহ বলিল—ভণ্ডের ভণ্ডামী আর কত-দিন ছাপা থাকে। এই সময় হঠাৎ একদিন নাটোরের প্রধান কর্ম্মচারী বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় তারাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবীর পূজাদি সমস্ত শেষ হইয়াছে, তথাপি তিনি পূজক ব্রহ্মণকে পুনরায় ডাকিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতে বলিলেন এবং নানা উপাদেয় উপচারে দেবীর পূজা শেষ করিয়া, বামাচরণকে পরিতোষের সহিত আহার করাইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তথাকার কর্ম্মচারীবর্গ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উক্ত নাটোরের প্রধান কর্ম্মচারী তারা-পুরের সমস্ত কর্ম্মচারীবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—দেখ, আজ কয়েকদিন হইল—রাণী-মা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ভগবতী স্বয়ং রজনীযোগে তাঁহার শিরোদেশে বসিয়া বলিয়াছেন—"আজ দুইদিন হইল, আমার পূজাও হয় নাই, আর আহারও হয় নাই—

আমি উপবাসী আছি।” এই কথা শুনিয়া রাণী-মা ভয়ে নিদ্রোত্থিতা হইয়া দেবোদ্দেশে কতই কাঁদিলেন, জননীর নিকট কতই অনুনয় বিনয় করিলেন এবং পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিলেন। পথে আমার প্রায় দুইদিন বিলম্ব হইয়াছে; আমিও এই দুইদিন কিছু আহার করি নাই; প্রাণ একেবারে খারাপ হইয়াছে। মল্লারপুরের নিকটে আসিয়া আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মায়ের পূজা কিরূপ হইতেছে; সকলেই বলিল—যথারীতি হইতেছে। অবশেষে যখন আমি তারাপুরে প্রবেশ করি, তখন শুনিতে পাইলাম যে, পাগল বামা আমাদের চারিদিন উপবাসী, তাঁহাকে কেহ মায়ের প্রসাদ পর্য্যন্ত দেয় নাই। বামাচরণের উপবাসে দেবীও উপবাসী আছেন, তাই এত কোপাবিষ্টা; অতএব যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সাবধান—বামার সহিত আর কেহ কখন এরূপ অন্যায় আচরণ করিও না; তাহা হইলে সকলেরই কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে। ঐ পাগল সামান্য পাগল নহে। তোমার আমার সাধ্য কি যে উহাকে চিনিতে পারি! মায়ের ছেলে মায়ের ক্রোড়ে প্রস্রাব করিয়াছে; ইহাতে তোমার আমার কি? তোমরা তাহা পরিষ্কার করাইবে—এই তোমাদের কার্য্য। এই বলিয়া তিনি সেই বারের মত সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে বামাকে মায়ের ভোগ অগ্রে দিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে আর কেহ বামাচরণের বিরুদ্ধাচরণ

করিত না, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে করযোড় করিত। মায়ের দুলাল, পাগল ছেলে বামাচরণ মেঘনির্মুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। তখন বামাচরণের জাতি বিচার ছিল না; খাদ্যাখাদ্য তিনি কোনরূপ বিচার করিতেন না। ভাল মন্দ তুমি যাহাই তাঁহাকে দিবে, তিনি তাহাই উদরসাৎ করিয়া ফেলিবেন। মায়ের ভোগের সময় তাঁহার ভোগ শিমূল-তলায় তাঁহার আসনের নিকট রক্ষা করা হইত। তিনি খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় একটী অস্পৃশ্য কুকুর আসিয়া তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল; বামার তাহাতে ঘৃণা নাই, একত্রেই আহার করিতে লাগিলেন। শৃগাল, কুকুর তাঁহার নিকট মিত্র-ভাবে একত্র বাস করিত। শৃগাল ও কুকুর লইয়া বামাচরণ কতই আনন্দ করিতেন। তিনি তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলে, তাহারা যেখানে অবস্থান করুক না কেন, তাঁহার ডাক শ্রবণ মাত্র দৌড়িয়া আসিত এবং বামা যাহা বলিতেন তাহাই করিত। বামা তাঁহার প্রিয় কুকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কালু! অমুককে ডাকিয়া লইয়া আইস। কালু তাহার বাটীতে গিয়া ভয়ানক রূপে চীৎকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল—তাহাতেই গৃহস্বামী বুঝিতে পারিল, বামার ডাক পড়িয়াছে। তিনি অমনি চলিয়া আসিতেন। এমন শুনা গিয়াছে, বামাচরণকে উপর্য্যুপরি বিনা আহারে কেহ কেহ অতিরিক্ত মদ্য পান করাইত, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র মত্ততা উপস্থিত হইত না, আবার মদ্য পান না করিলেও যে তিনি কোন কষ্ট অনুভব করিতেন—তাহাও নহে।

তিনি নরাকারে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিতেন বটে কিন্তু সেই দেহস্থিত কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত ছিলেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বামাকে দেখিলে অনেক সময় রুক্ষ-স্বভাব বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন— তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার শরীরে রাগ ছিল না। তুমি অকথ্য ভাষায় গালি দাও, বামা কেবল হাসিতে থাকিবেন। কোন কামনা নাই—ভক্ত ভিন্ন কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না, তথাপি তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্য কোথা হইতে কিরূপে সংগ্রহ হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের চক্ষে বামা মানব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নরাকারে দেবতা। তিনি জীবিত অবস্থায় প্রথমে কয়েক বৎসর অর্থ-সঞ্চয়ে মন দিয়াছিলেন। কেহ কোনরূপ প্রণামী দিলে তিনি তাঁহার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিতে বলিতেন, কারণ কনিষ্ঠ রামচরণ কোন কাজ কর্ম্ম করে না, এই অর্থে তাহারই সংসার চলিবে, পরে রামচরণ ইহলীলা সম্বরণ করিলে তিনি আর অর্থ স্পর্শ করেন নাই। বাল্যে যখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, সেই সময় সংসারে অর্থকষ্ট দেখিয়া তিনি প্রত্যহই তারামায়ের নিকট আসিয়া বলিতেন—মা! আমাদের কি অর্থ কষ্ট ঘুচ্‌বে না? বোধ হয় অভীষ্ট ফলদাত্রী মা আমার, বামার সেই ভোগ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস যাহারা অমানুষিক ক্রিয়া কাণ্ড দেখাইতে পারে না, পীড়ায় নানা প্রকার ঔষধ দিতে পারে না, যাহারা

নানা তীর্থ ভ্রমণ করে না, শাস্ত্রের সুচারু ব্যাখ্যা করিতে বা গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে পারে না, তাহারা আবার সাধু কিসের এবং তাঁহার চরিত্রই বা পাঠ করা কেন? যাহাদের এইরূপ ধারণা, তাহাদিগকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি। তবে বামাচরণ কখন কখন দুই একজন ভক্তের অনুরোধ রক্ষার্থে দুই একটী কঠিন ব্যাধি কেবল মাত্র বাক্যের দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সময় বুঝিয়া ধরিতে পারিলে, তিনি সাদা কথায় অনেক গূঢ় রহস্য পাগলামীর ছলে বলিয়াও ফেলিতেন, তাহা অতিশয় গভীর ভাবপূর্ণ; তিনি বলিতেন—"জপাৎ সিদ্ধিঃ" বাবা, কিছুরই দরকার নেই, কেবল জপ কর, বাসনা সিদ্ধি হবে।" মদীয় পূজনীয় গুরুদেব বামার বড়ই প্রিয় এবং তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বামার চরণ দর্শন করিতে তারাপুরে গমন করিতেন এবং সাত আট দিন তাঁহার চরণ-প্রান্তে অবস্থান না করিয়া বাটী ফিরিতেন না। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকেও সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে অনুরোধ করিতেন। আমার জনৈক গুরু-ভ্রাতার ভগ্নীপতির কঠিন কাশের পীড়া হয়। জ্বরভুক্ত কাশরোগে রোগী শয্যাশায়ী হইল। কত চিকিৎসা, কত স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাওয়া হইল। ধনী শ্বশুর—জামাতার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, সকল চিকিৎসকই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। অল্প বয়সে

কন্যার বৈধব্য নিশ্চয় ভাবিয়া পিতা-মাতা যারপরনাই ম্রিয়মান হইলেন, কিন্তু উপায় কি? এই সময় মদীয় গুরুদেব একদিন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। আমার গুরুভ্রাতা কাতরতা সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুদেব! আর কি কোন উপায় নাই? তিনি বলিলেন—বাবা! আয়ু না থাকিলে আর উপায় কি? তবে সমস্তই ত' করা হইয়াছে; অন্য খেদ ত' আর কিছুই নাই; কিন্তু একবার বামার নিকট যাইয়া দেখিলে হয় না? এই কথায় সকলের ইচ্ছা হইল। পরদিন তাঁহার আদেশ মত মহাসন্তর্পণে সেই অতীব দুর্ব্বল রোগীকে লইয়া তারাপুরে রওনা করিলেন। গুরুদেব যাইলেন, রোগী যাইলেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে রোগীর দুই শ্যালক গমন করিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা তারাপুরে উপস্থিত হইলেন। সাধুদর্শন করিতে হইলে হৃদয়ে অকপট অনুরাগ ও ভক্তির প্রয়োজন, যাঁহারা বামাচরণের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার অসীম দয়া লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সহজে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই ঘটনাটী আমাদের প্রত্যক্ষ বলিয়াই প্রকাশ করিলাম।

গুরুদেব শিষ্যগণ ও রোগীসহ তিন চারিদিন তথায় অবস্থান করিলেন; তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিলেন কিন্তু পাগলা কিছুতেই সে কথায় কর্ণপাত করে না। ক্রমশঃ বিদেশে সেই মুমূর্ষু রোগীর

কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। এদিকে প্রাণপণে তাঁহারাও পাগলকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে বামা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আপন মনে অমৃতকুণ্ডের সোপানে বসিয়া আছেন, এমন সময় আমার গুরুদেব দলবলসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং একটী সোপানে ভর প্রদান করিয়া কিয়ৎক্ষণ রোগীকে বসাইয়া রাখিলেন। বামার অন্তঃকরণ সদা প্রফুল্ল, মলিন ভাব তাঁহার কেহ কখন দেখে নাই। তিনি বলিলেন কিরে বেদো শালারা! এ রোগীকে আবার এখানে কেন মার্ত্তে এনেছিস্, এই শ্মশানেই বুঝি রেখে যাবি? বলিয়া হাসিতে লাগিলেন

রোগীর জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিল—বাবা! রেখে যাব কেন? যখন আপনার পদপ্রান্তে এনেছি, তখন উহার রোগ নিশ্চয়ই আরাম হবে।

ক্ষেপা—কেন হে বাপু! আমি কি কবিরাজ, যে রোগ ভাল ক'র্ব।

রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁদিয়া বলিল—বাবা! কবিরাজ কি এ রোগ ভাল ক'র্ত্তে পারে। আপনার মত সাধুপুরুষের দয়া না হলে, এ রোগ ভাল হয় না। ক্ষেপা হাসিতে হাসিতে বলিল—তুই শালা বড় বালক? এই বলিয়া বামা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শোধিত সুধা লইয়া তাহা উদরস্থ করিলেন। সেই মদ্য পান করিয়া এরূপ চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন যে, তাহার তারা বহিয়া অনবরত অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রোগী বামার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই কৃতাঞ্জলীপুটে বলিল—বাবা! তোমার দয়া হইলে সবই হইতে পারে।

বামার কর্ণে রোগীর সেই কাতর প্রার্থনা প্রবেশ করিল। বামা এইবার তাহার নিকটে আসিয়া পিতা যেমন পুত্রকে তিরস্কার করে, সেইরূপ সেই দুর্ব্বল রোগীর গলদেশ টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন—পাজি! পাপ কর্‌বার সময় একথা মনে থাকে না। বামা জোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। ইহাতে সেই দুর্ব্বল রোগীর জিহ্বা বাহির হইবার উপক্রম হইল। সকলেই ভীত হইয়া বলিলেন—বাবা! করেন কি? করেন কি? মরে গেল, মরে গেল, বলিয়া সকলে তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইলেন। মাংস সাধনায় সিদ্ধ অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধ সাধক বামাচরণ বলিলেন—যা শালা বেঁচে গেলি। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষের অমোঘ বাক্য সফল হইল। সেইদিন বৈকাল হইতে রোগীর আর জ্বর হইল না; পরদিন মায়ের সকল প্রকার প্রসাদ রোগী হজম্ করিল, তাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট হইল না—প্রত্যহ কাশীর সহিত যে রক্ত দেখা দিত, সেদিন হইতে আর তাহা দেখিতে পাওয়া গেল না। রোগীকে ক্রমশঃ আরোগ্য পথে আসিতে দেখা যাইতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া আরও কয়েকদিন তথায় অবস্থান করতঃ বামার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখন সেই রোগীটী সম্যক্ প্রকারে সেই অসাধ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ দেহ ধারণ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আর তাঁহার কোন প্রকার

দৈহিক গ্লানি নাই। মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত কি এরূপ অঘটন ঘটিতে পারে ?

একজন লোক বামাচরণকে মদ্যপানে মত্ত করিবার জন্য তিন দিন অনবরত মদ্য পান করাইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; শেষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর একদিন একজন বামাচরণকে মাংস খাওয়াইবে বলিয়া বসন্ত রোগীর মৃতদেহের পচামাংস আনিয়া খাইতে দিয়াছিল; বামাচরণ তাহাই উদরস্থ করিয়া ঠিক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোনপ্রকার পীড়া বা দৈহিক কোন প্রকার গ্লানি পরিলক্ষিত হয় নাই।

বামাচরণ পূর্ব্বে অর্থ সংগ্রহ করিতেন বলিয়া জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে কয়েকখানি বহুমূল্য অলঙ্কার দিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটী বোধ হয়, মনে করিয়াছিলেন—বামার বুঝি তখন অর্থের লালসা আছে। এইজন্য তিনি নানাবিধ রত্নালঙ্কার বামার পাদপদ্মে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। বামা মৃদু-হাসি হাসিয়া, তাহা কুড়াইয়া লইলেন এবং বলিলেন—এই দেখ আমার অলঙ্কার, ইহার তুল্য আর কি আছে ? এই বলিয়া হাড়ের মালা দেখাইলেন এবং হস্তস্থিত অলঙ্কারগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মনে কোন রুক্ষভাব না থাকিলেও বামাচরণ প্রায়ই সকলকে শালা বলিয়া আহ্বান করিতেন; কখন বা আসুন মশাইও

বলিতেন। যাহারা জানিত না, তাঁহারা রাগিয়া যাইত, এবং নানা অসাধু ভাষায় তাঁহাকে গালি দিত। বামাচরণ তাহাতে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিতেন—সাধু কি চোরের কথায় রাগ করে?

একবার কোন মোকর্দ্দমায় বামাচরণকে সাক্ষ্য মানা হইয়াছিল। আসামী ও ফরিয়াদি উভয়েই তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইবার জন্য বড়ই যত্ন করিয়াছিল। কিন্তু বামাচরণ বলিয়াছিলেন —ওরে শালারা! আমাকে আদালতে উঠিতে হইবে না। সাক্ষ্যও দিতে হইবে না। তোদের দু-শালারই দণ্ড হইবে। যথাকালে হাকিমের বিচারেও তাহাই হইয়াছিল। এরূপ সাধু-পুরুষের অমোঘ বাক্য কি কখন মিথ্যা হইতে পারে? বাক্‌-সিদ্ধতাই যে মহাপুরুষের লক্ষণ, তাহা কে না স্বীকার করিবে? বামার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ অধুনা আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বামা তারাপুরের সেই নিভৃত নিবাসে অবস্থান করিয়া তারা নামে প্রাণ মাতাইতেন, আর উদাস-প্রাণে তারামায়ের নাম-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, তারা নামে বিভোর প্রাণে গাহিতেন:—

"ডুব দেনা মন কালী ব'লে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন পলে পলে॥"

বামা এই রত্নাকরে রত্ন আহরণের জন্য ডুবিয়া থাকিতেন। তাই সময়ে সময়ে তাঁহাকে ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইত না।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভক্ত-সঙ্গে।

একদিন গ্রীষ্মের দারুণ মধ্যাহ্নে বামা একাকী বসিয়া তাঁহার শৃগাল কুকুর লইয়া খেলা করিতেছেন। ছেলেরা যেমন কুকুর লইয়া দৌড়াদৌড়ি করে, বামাও সেইরূপ করিতেন। ঠিক দেখিতে না জানিলে এ সময় তাঁহাকে পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না। দারুণ রৌদ্রে, অনেকক্ষণ খেলা করিয়া বামা একটী বৃক্ষতলায় উপবেশন করিলেন। পশুগুলিও তাঁহার আশে পাশে শয়ন করিল। এমন সময় দূরদেশ হইতে একজন ভক্ত আসিয়া ক্ষেপার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাহাকে দেখিয়া বামা বলিলেন—তুই এসেছিস্, আমার জন্য কি এনেছিস্? ভক্তেরা যাহা অনিত—তাহাই দিত। ক্ষেপা পাইয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যে ভক্তটী আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে দেখিলে বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয়,—তবে গোঁড়া নহে। অনেকক্ষণ উপবেশন করতঃ বামার সেবাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! তান্ত্রিক- সাধকের মহিমা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ক্ষেপা কিয়ৎক্ষণ বালকের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার

দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালক যেমন এক বিষয় ভাবিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে; বামা সেইরূপ ভাস্বর-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর বলিলেন—কেন রে তোর কি হ'য়েছে?

ভক্ত। প্রভু! আমাদের বাড়ীর কাছে একজন তান্ত্রিক সাধু এসেছেন—তারই কথা বলিতেছি?

ক্ষেপা। সংসারী না সন্ন্যাসী?

ভক্ত। সন্ন্যাসী।

ক্ষেপা। তবে তুই কি তার বিষয় বুঝ্‌বি?

ভক্ত। তাঁর কাজ কর্ম্ম দেখে শুনে বড়ই ঘৃণা হয়।

ক্ষেপা। ঐত দরকার,—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাকে সকলে ঘৃণা করে, তাকে মা যে কোলে করে, তা কি জানিস্?

ভক্ত। প্রভু। হাসিবেন না, আমি আর একজন গৃহীকেও ঐরূপ দেখিয়াছি; সে অনবরত মদ-মাংস খেতো, কিন্তু শাস্ত্রে ত' অন্য রকম আছে, আপনিই বলেছেন।

ক্ষেপা। সে সংসারী শালা বেদো, বেদো! মায়ের নামে যে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে, তার নাম ক'র্ত্তে নাই।

ভক্ত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—এসব শাস্ত্রে আছে।

ক্ষেপা। তার গুষ্টির মাথা। শাস্ত্র কি আবার লোক-হাসাবার উপদেশ দেয়! যাহারা কিছুই জানে না; তাহারাই

কেবল তারামার শাস্‌তোরটাকে নষ্ট করে; সে শালারা বেদো।

ভক্ত। তবে শাস্ত্রে কি আছে বাবা?

ক্ষেপা। আমি অত শাস্‌তোর টাস্‌তোর জানিনা বাপু; তারামাকে নিয়েই সব কারবার, তাঁকে জান্‌লেই হ'লো।

ভক্ত। তা'রা বলে,—কলিতে ঐরূপ উপাসনাই দরকার নতুবা সিদ্ধি লাভের উপায় নাই।

ক্ষেপা। দেখ বাপু! ভক্তের সাধনা বড়ই গুপ্ত, ইহা লোক দেখাবার জিনিষ নয়, তাই গুরু বল্‌তেন—"গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ" তুমি যে কেউ হওনা কেন—সাধনা কখন লোক দেখিয়ে কর্ব্বে না, তাতে তোমার সাধনা ভাল হবে না। লোক দেখিয়ে কেবল পূজাদি ক'র্ত্তে হয়; সাধকের সাধনা খুব গোপনে, কেউ না জান্‌তে পারে, জান্‌লেই পণ্ড। এই বলিয়াই ক্ষেপা হো হো করিয়া হাসিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। বামার বাহন কুকুরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

এই লোকটী আরও দুই একবার বামার কাছে আসিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার ভাব-গতিক ভালরূপ জানিতেন, তাই উঠিয়া যাইলেন না। ভক্তটী মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"আহা! ইঁহার কি সরল ভাব, এই গুণেই বামা মাকে বাঁধতে পেরেছে! মনে এইরূপ অকপট ভক্তি না হলে কি ভগবান্‌কে বাঁধতে পারা যায়?" ভক্তটী বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় বামা আবার হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন—কি

গো এখনও বসে আছ, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো, না এখনও দাঁত ছিরকুটে বসে আছ, কলিতে প্রাণ-ধারণের মত আগে খাওয়া দরকার, তারপর সাধন-ভজন—জানো ?

ভক্ত। হাঁ বাবা, তা জানি, আমি খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসেছি।

ক্ষেপা। তাই ভালো, আমি মনে ক'রেছি, এখন বুঝি কিছু খাওনি, তাই আবার দৌড়ে এলুম।

ভক্ত। আজ্ঞে না, তা হয়েছে ; তবে অনেক দিন আপনার চরণ দর্শন করিনি,তাই একবার আপনার চরণ দর্শন ক'র্ত্তে এলেম।

ক্ষেপা। এ আগুড়ে পা দেখে কি হবে বাবা—পা দেখ্তে হয়ত' তারা-মায়ের সেই খুর্খুরে রাঙা পা দু'খানি দেখ্তে শেখ, তা' হলে আর দেখার সাধ কিছুই থাক্বে না, সেই দেখাতেই সব দেখার সাধ মিট্বে।

ভক্ত। বাবা ! সে দেখা কি সহজ !

ক্ষেপা। খুব সহজ, ছেলে মাকে দেখ্বে, তার আর শক্ত কি ? মাকে কেঁদে ডাক্লেই সে বেটী দেখা দেয় ; ভক্তি আর বিশ্বাস থাক্লে মাকে পেতে আর কিছুই শক্ত নেই। আমি বাবু, অত যোগ-যাগ বুঝি না, কেবল সময় নষ্ট। যখন কেঁদে ডাকলেই পাওয়া যায়, তখন অত কষ্ট কেন ?

ভক্ত। আমি অনেক তান্ত্রিক সাধক দেখেছি, তারা মদ খেয়ে খুব কান্নাকাটি করে, খুব ডাকে কিন্তু তারা তো তারা-মাকে পায় না ?

ক্ষেপা। তারা ডাক্‌তে জানে না, সে ডাক তত দূর পৌঁছায় না, তারা-মা শুন্‌তে পায় না; বেটী যে আবার একটু কানে খাটো, ডাকার মত জোর করে ডাকলেই তার ঘাড়কে শুন্‌তে হবে।

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। মায়ের মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। সেই ভীমভাব-পূর্ণ শ্মশানের ঘোর অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিল; আর কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আরতির সেই গুরুগম্ভীর কাড়া-নাক্‌ড়ার আওয়াজ তারাপুরের শ্মশান-ক্ষেত্র আলোড়িত করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময় এখানে অবস্থান করিলে মনে স্বতঃই কি যে এক অভাবনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়—তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। আরতি শেষ হইলে আর জন-মানবের সমাগম থাকে না। কেবল মাঝে মাঝে দুই একজন পাণ্ডা লণ্ঠনের সাহায্যে যাতায়াত করিয়া থাকে, আর সময়ে সময়ে বামার বাহন শৃগাল-কুকুরের ভীষণ কণ্ঠধ্বনি শ্মশানের সেই ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দেয়। ভক্তটী সেইদিন তথায় অবস্থান করিবার মানস করিয়া আসিয়াছিলেন। আরতির পর যে সকল আহরীয় আনিয়াছিলেন। বামাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইলেন এবং সেই নিভৃত নিবাসেই রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

বামার নিকট প্রায়ই লোকের সমাগম থাকিত, কিন্তু আগন্তুক ভক্তটীর নিতান্ত সৌভাগ্য যে সেদিন আর কেহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, কেবল বামা আর তিনি।

সমস্ত রাত্রি উপদেশ গ্রহণের বিশেষ সুবিধা হইবে, বিশেষতঃ পাগ্‌লা আর তত দৌড়াদৌড়ি করিবে না। আহারাদির পর ভক্তপ্রবর বামার সেবায় রত হইলেন। সেবা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা ঠাকুর! তন্ত্রশাস্ত্রটা কেবল কলির জন্য?

ক্ষেপা। এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

ভক্ত। অনেকে বলেন—অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে ভগবান্ মহাদেব উহার প্রচলন করিয়াছেন।

ক্ষেপা। সে কথা ঠিক বটে; গীতার ন্যায় ইহাও অপৌরুষেয়, ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বটে। তবে শুধু কলিতে কেন, এ চিরকালই আছে; তা না হলে বশিষ্ঠদেব সিদ্ধ হলেন কিসে? সে ত' এ যুগের কথা নয়?

ভক্ত। ইহা কি বেদের অংশ?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই; তবে জটেবেটা জীবের দুঃখু দেখে এই কলিতে ইহাকেই প্রবল করেছে। মানুষ কলিকালে সামান্য দিন বাঁচবে, কখনই যোগ-যাগ করবে, আর কখনই বা ভোগাভোগ করে নিবৃত্তি-পথে আস্‌বে, সে সময় কই? তাই দয়াময় এত দয়া করেছেন, জানিস্? তবে যার ভক্তি-বিশ্বাস আছে, তার কিছুই দরকার নেই। তোর তান্ত্রিক-সাধনায় নানাপ্রকার সন্দেহ, নয়?

ভক্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত' আপনাকে সময়ে সময়ে এর জন্য এত বিরক্ত ক'র্ত্তে আসি।

ক্ষেপা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আমার কাছে এসে কি হবে, আমি কি শাস্‌তোর টাস্‌তোর জানি—"তারা-মা" "জয় তারা"—আমি পাগল ছেলে।"

ভক্ত। বাবা! মায়ের পাগল ছেলেই ত' সব কথা বল্‌তে পারে; শাস্ত্রটাও যে পাগলের তৈয়ারী। পাগল না হইলে কি সেই তত্ত্বাতীত বিষয় কেহ আয়ত্ত করিতে পারে?

ক্ষেপা। তুই অত সাধু-ভাষা বলিস্ কেন, আমি ওসব কথা অত বুঝ্‌তে পারি না।

বামাচরণ সকল সময়েই প্রায় পাগ্‌লামী করিয়া লোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যে নাছোড়-বান্দা, সময়ের অপেক্ষা করিয়া বহুকষ্টেও সঙ্গত্যাগ করিত না; বামা তাহাকে গোপনে অনেক কথা বলিতেন। সে কথায় ভাষার কোন পারিপাট্য থাকিত না, সময়ে সময়ে আকার-ইঙ্গিতেও অনেক কথা বুঝাইয়া দিতেন, বা এমন গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিভেন যে, তাহা ভাষায় স্থান পায় না। যাহা হউক, বৈষ্ণব ভক্তটীর সৌভাগ্য যে আজ বামাকে গোপনে একাকী পাইয়াছেন।

ভক্ত বলিলেন—"প্রভু! আমার সন্দেহ দূর করুন, আমি বড়ই বিপদে পড়েছি।"

বামা বলিলেন—"দেখ, আমি গুরুর মুখে যা যা শুনিছি—তাই বল্‌ছি শোন্। দেখ, কে কোন্ পথ ধরে যে মাকে পায়, তা বল্‌বার যো নাই, সে দয়াময়ীর দয়া; তিনি পাষণ্ডকেও

উদ্ধার ক'র্ত্তে পারেন, আবার ভাল লোককেও উদ্ধার ক'র্ত্তে পারেন। তাঁর দয়া হলে কি না হতে পারে। তবে তন্ত্রের সাধনা কলিতে কি রকম জানিস্—যোগ-ভোগ এক সঙ্গে, কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে যোগ-ভোগ এক সঙ্গে লাভ হয়। এখন যোগের সময় কোথা, কদ্দিন বাঁচ্‌বি? তাই ভগবান্ সহজ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। শুক্‌নো সাধকগুলোর যেমন রাঙা চোখের পানী পড়েই আছে—ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান ক'রে কেবলই কান্না, বীরাচারী সাধকের তেমন নয়, সব জোর, মার ছেলে যেমন হয়। তাই তাদের পূজাও খুব গুপ্ত, লোক দেখিয়ে বাহাদুরী করে না। দেখোনি সাধক নিজে প্রতিমা গড়ে, খুব নির্জ্জনে, নিশাভাগ রাত্রে মায়ের পূজা করে।

ভক্ত। তাঁহারা কি বাহ্যিকভাবে পঞ্চ-মকার ক'রে দেবীকে সন্তুষ্ট করেন?

বামা। তন্ত্রে আন্তরিক কিছু নাই। সবই বাহ্যিক, বাহ্যিক ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আন্তরিক আপনি হয়; যেমন স্বপ্ন দেখা—আগে প্রত্যক্ষ করা আছে, তাই ত' স্বপ্নে দেখা হয়?

ভক্ত। তবে ঐ রকমই কি কর্ব্বো?

ক্ষেপা। তবে ইহার মধ্যে কথা আছে—তান্ত্রিক সাধক মায়ের আব্দারে ছেলে; কিন্তু এটা ঠিক যে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না হইলে কেহই মায়ের কোলে উঠ্‌তে পায় না। সাধনার দুটী পথ আছে—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি—ভোগ আর নিবৃত্তি—যোগ। যাহারা একেবারেই নিবৃত্তি-পথে আসিয়াছে,

তাহাদের এক জন্মের সাধনা নয়, জন্ম-জন্মান্তর হ'তে তারা ভোগ-বাসনা চরিতার্থে ক'রে তবে নিবৃত্তি মার্গে এসেছে। এখন তাদের অরুচি হ'য়েছে—তাই নিবৃত্তি। ইহাদের আর পতনের ভয় নাই! আর যাহারা জোর ক'রে নিবৃত্তি ক'র্‌তে যায়—তাহাদেরই পতন। ভোগ তোমাকে ক'র্ত্তেই হবে—নতুবা নিবৃত্তি আস্‌বে কেমন ক'রে। কর্ম্ম ও ভোগের শেষ না হইলে মানুষ নিবৃত্তিমার্গে আস্‌তে পারে না। তোমার একটী ভাল জিনিস খাইতে ইচ্ছা আছে, বা একটী ভাল বিষয় ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু তুমি জোর ক'রে তাকে দমন ক'র্‌তে পার কি? একজনকে তুমি ভালবাস, যতদিন তাহার তৃপ্তি না হইবে—ততদিন তুমি তাহাকে ছাড়্‌তে পার কি? যদি তৃপ্তি হ'তে না হ'তেই ছেড়ে দাও, তাহা হইলে এক সময় না এক সময় সেই অতৃপ্তি তোমার পতনের কারণ হইবে।

ভক্ত বলিলেন—"তবে বাহ্যিক পঞ্চ-মকার শাস্ত্রের বিধান?"

ক্ষেপা। সামান্য অধিকারীর পক্ষে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত পঞ্চ-মকার নিবৃত্তির পথে। সধবা নারীর পতি-প্রেম, আর বিধবা নারীর পতি-প্রেম যেমন তফাৎ, এ সেই রকম। রাধিকা বৃন্দাবনে যখন কেলে-ঠাকুরটীর সঙ্গে খেলা ক'র্‌তেন—তখন তাঁর মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদির ভাব, আর যখন কেলে ছোঁড়া মথুরায় চলে গেল—তখনকার ভাব আগমসারাদির ভাব।

ভক্ত। হাঁ তা ত' ঠিক!

ক্ষেপা। ভালবাসা দুই প্রকারে নিবৃত্তি হয়, এক বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া অপর তাঁহাকে চিন্তা করিয়া। বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যাহা, তাহা প্রবৃত্তিমার্গে, আর তাঁহাকে চিন্তা করিয়া যে তৃপ্তি, তাহা নিবৃত্তিমার্গে।

এই গুরুভাবপূর্ণ অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তটীর চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ক্ষেপা বলিলেন—দেখ! কালের শক্তি কালী, তন্ত্রের মতে কালী-সাধনা না ক'র্‌লে লোক ঈশ্বর উপাসনায় অধিকারীই হইতে পারে না।

ভক্ত। ঈশ্বরোপাসনার পূর্ব্বে কি সকলকেই শক্তি-সাধনা ক'র্‌তে হয়?

ক্ষেপা। হাঁ, তা হয় বৈ কি। কেহ বা প্রত্যক্ষ-ভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে ঐরূপ সাধনা ক'রে থাকে। পূর্ব্বে তোমায় এবং আরও কয়েক জনকে পরোক্ষ অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চ-মকার সাধনার কথা ব'লেছি। গুরুদেব ব'লতেন—মেরুদণ্ডের দুই ধারে ঈড়া পিঙ্গলা নামে দুইটী স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ ও তাহার মধ্যে সুষম্না নামে একটী নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীর নীচে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে, যখন ঐ শক্তি জেগে উঠে, তখন ঐ নাড়ীর ভিতর দিয়ে উঠ্‌বার চেষ্টা করে, যতই সে উঠ্‌তে থাকে, ততই যোগীর নানা রকম অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। যখন ঐ শক্তি মস্তকে উঠে, তখন যোগী শরীর ও মন থেকে আলাদা হয়ে যায়, এই সময় তার আত্মার মুক্ত-ভাব

প্রকাশ পায়। যোগিগণ প্রাণায়াম যোগ দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগায়; আর তান্ত্রিকগণ পঞ্চ-মকারের দ্বারা সহজে তা জাগাতে পারে।

ভক্ত। তবে আপনি আমাদের গ্রামে যে তান্ত্রিক এসেছে তার মত হ'তে বলেন—নয়?

ক্ষেপা। না-হে-না, আমি কি ব'ল্‌ব, সব সেই তারা-মা বলেন—গুরু মুখে যা শুনেছি তাই ব'ল্‌ছি।

ভক্ত। তবে কি বলুন?

ক্ষেপা। মদ্ খেলে জাতিপাত হয়। মদ্ খেয়ে মাৎলামী করা—বা কোন রকম খারাপ আচার ব্যবহার করা, কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই। তান্ত্রিক-সাধনায় অভিষেক আছে, অভিষেক মানে গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে এক পদ থেকে অন্য পদে তুলিয়া দিতে পারেন, সেই তুলে দেবার নাম—অভিষেক। এই শোধিত মদ্যাদি নিয়মিত পরিমাণে পূজার সময় ব্যবহার করিলে নির্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে, তাই উহাকে শাস্ত্রে সঞ্জীবনী সুধা ব'লেছে। অভিষিক্ত শিষ্য না হইলে পঞ্চ-মকারের অধিকারী হইতে পারে না, এমন কি ছুঁইলে নরকে পচ্‌তে হয়। সাধক গুরুর কৃপায় অধিকারী হইলে কেবল নির্জ্জনে পূজার সময় মাত্র পঞ্চ-তোলা পরিমিত পঞ্চপাত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি মত্ততা আসে, তাহা হইলে তাহাও করিতে পারিবে না। পূজার সময় আসনে বসিয়া পঞ্চ-মকার শোধন ব্যতীত ব্যবহার করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, যে করে সে শাস্ত্রের কিছুই জানে না।

যথার্থ মন্ত্রপূত শোধিত ঐরূপ পঞ্চ-মকার ঐরূপ পরিমাণে গ্রহণ করিলে সাধকের চিত্তচাঞ্চল্য কিছুতেই হবে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত সত্য। তবে যদি যথেচ্ছা ব্যবহার কর—তাহা হইলে কি শাস্ত্র তার জন্য দায়ী? তুমি যদি বিধির বিধি উল্লঙ্ঘন কর, তো দোষ কার? শোধিত পঞ্চ-মকারে আসুরিক বৃত্তি আসিয়া সাধককে উত্তেজিত করিতে পারে না—ঐ পরিমাণে খে'লে। প্রকৃত অধিকারী হইয়া শুক্রাচার্য্য প্রভৃতির অভিশাপ মোচন না করিয়া খাইলে শুকরের প্রস্রাব পান করা হয়—তাহাতে আসুরিক প্রবৃত্তি বাড়্‌বে না ত' কি?

ভক্ত। তবে যে অনেকে শোধন না ক'রে ওসব করে, তাহা হইলে তাহারা পাপ করে?

ক্ষেপা। পাপ করে না, খুব পাপ করে। ধর্ম্ম করিতে গিয়া চরিত্র নষ্ট করিলে—তাহার উন্নতি কোথায়? চরিত্রই ত' মানুষের অমূল্য-সম্পত্তি। চরিত্র নষ্ট ক'র্‌লে ত' তুমি মনুষ্যত্ব নষ্ট ক'র্‌লে, তোমার উন্নতির আশা কোথায়? তবে সাধনক্ষেত্রে এক প্রকার অঘোরী-অবস্থা আছে—তাহা অবধূতের অবস্থা, ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবস্থা, সাধারণ চক্ষে মৃতের অবস্থা, তখন তাহার কিছুই বিচার থাকে না। সে অবস্থা, সাধনার চরমাবস্থা। তখন আর তাহাতে সে থাকে না। তখন তাহাতে 'তাঁহাতে' মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। বেটী যে কাহাকে কোন্ পথ দিয়ে আপনার কোলে টেনে নেয়—তাহা কেহ বলিতে পারে না, তারামায়ের যেমন ইচ্ছা। আমি অত তত্ত্ব কিছু বুঝি না, কলিতে ভক্তি

আর বিশ্বাসই সার—আর ইহাই অতি সহজ পন্থা। তবে ঐ অঘোরীরা, উহারা চতুর্থ আশ্রমী—অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পথে। তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করেন না, লোকালয়ে কখন আসেন না, তাঁহারা আসব অর্থাৎ সিদ্ধ মদ্যপানে সর্ব্বদাই মত্তভাবস্থায় অবস্থান করেন। তখন আর তাহাদের আমিত্ব থাকে না, তত্ত্বমসি লাভ হ'য়ে গেছে। সে অবস্থার লোককে সহজে চেনা যায় না, তখন তাহাদের আর বাহ্যিক কোন বিষয় জ্ঞান থাকে না! তাঁহারা তখন দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছেন। দেহের সহিত আর তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জগতের সহিতও আর তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহারা মায়ের সহিত একমাত্র সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। সে অবস্থা কি সহজে হয় রে বাবা?

বামা আজ প্রায় সমস্ত রাত্রি গোপনে ভক্তটীর সহিত তন্ত্রের নানা কথার আলাপ করিলেন। রজনী-শেষে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া আপনার খেয়ালে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভক্তটীও আজ কয়েক দিন আসিয়াছেন—আর থাকিতে পারিলেন না। প্রাতঃকাল হইবামাত্রই বামার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখ-দুঃখ।

একদিন বসন্তের প্রাতঃকালে, যখন শাখি-শাখে বসিয়া পাখিগণ কলরব করতঃ রজনীর অবসান-বার্ত্তা সকলের নিকট প্রচার করিতেছিল; যখন সুমধুর মলয়ানীল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীব-জীবনে আনন্দ-দান করিতেছিল, তখন বসন্তের সেই মধুর প্রাতঃকালে বামাচরণ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পঞ্চবটী মধ্যে বসিয়া আছেন; কয়েকজন ভক্তও তাঁহার নিকটে নিদ্রিত ছিল। বামাচরণকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারাও জাগরিত হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিতে নদীতীরাভিমুখে গমন করিলেন। বামাচরণ একাকী বসিয়া আছেন। বালক যেমন নিদ্রোত্থিত হইয়া জননীর নিকট আব্দার করে; পাগলও সেইরূপ আব্দার করিতে লাগিলেন,—"তারা-মা! তুই এমন নিদয়া কেন মা? ছেলেকে যে মায়ে এত কাঁদায়—তা আমি কোথাও দেখিনি, ধন্যি কিন্তু তুই। তবে বেটী তুই যতই কেন কষ্ট দেনা, বামা কিন্তু "না-ছোড়বান্দা" বামাকে ফাঁকী দিতে তুই কিছুতেই পারবি না," এই বলিয়া গান ধরিলেন,—

"আর কারে ডাক্‌বো শ্যামা
ছেলে কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
মা বলিব যাকে তাকে ॥
মা যদি ছেলেরে মারে,
ছেলে কাঁদে মা মা, ক'রে,
ঠেলে দিলে গলা জড়িয়ে ধরে
ছাড়ে না মা যত বকে ॥"

নামেই অশ্রুপাত! তারা-নামেই তারা-দাস বামার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। হরি হরি বলিয়া বামাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—শ্যামা মা! কোথায় যাচ্চ; এস মা! পাগলের মনে আবার কি উদয় হইল— পাগল হাততালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর
বাজ্‌বে আমি শুন্‌তে পাব।"

নাচিতে নাচিতে বামা বসিয়া পড়িলেন; ভাবে বিভোর। মুদিত-নেত্র হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে! তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। ভক্তগণ অনেকক্ষণ গিয়াছিলেন— এক্ষণে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া বামার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই চারিজন ভক্ত বিগত কল্য ভাগলপুর-

হইতে প্রভুর দর্শনে আসিয়াছেন। বীরভূম জেলায় ইহাদের কয়েক ঘর আত্মীয় ছিলেন; গুডফ্রাইডের ছুটীতে তাঁহারা তারা-পীঠে পাগলকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। এই ছুটীর কয়েক দিন আত্মীয় বাটীতে অবস্থান করিয়া তারামায়ের আদুরে ছেলে বামাকে দেখিবেন, উপদেশ-ছলে তাঁহার সেই পাগলামী-কথার অমৃত-সুধা পান করিয়া ধন্য হইবেন বলিয়াই এতদূর আসিয়াছেন। তিন চারি দিন ছুটীর সদ্ব্যবহার করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

তাঁহারা বামার এই বালক-ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ইহাদের মধ্যে একজন বেশ ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"মরি মরি; জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকিলে কি এ ভাব আসিতে পারে? এঁর আর সাধন-ভজনের আবশ্যক কি? যতদিন তাঁকে না পাওয়া যায়, ততদিন সাধন-ভজন; যতক্ষণ মাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ চীৎকার; কোলে উঠিলে আর চীৎকারের দরকার নেই।" এমন সময় বামার চৈতন্য হইল, ভক্তগণকে নিকটে দেখিয়া বলিলেন—"কিগো বাবুরা কখন এলে?"

তাঁহারা বলিলেন—"অনেকক্ষণ এসেছি বাবা, আপনি দেখেন নাই।"

বামা বলিলেন—"ওইত আমার দোষ; আমি বাবু লোকের তত্ত্ব নিতে পারি না বলে সকলে আমার উপর চটে যায়, পাগল আবার এসব কেমন ক'রে করে, কি বলো গো তোমরা?"

সকলে। "আজ্ঞে হাঁ, তাতো বটেই।"

এইবার বামা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলেন। আপনার মনে কি বকিতে লাগিলেন। সত্যপ্রিয় নামক একজন ভক্ত বলিলেন— "বাবা! কলিতে ধর্ম্ম কি?"

বামা। কলিতে ধর্ম্ম অন্য কিছু নাই। কেন, তোরা কি জানিস্ না, কলি ধর্ম্মের তিন্‌টে পা ভেঙ্গে দিয়েছে, একটা পা আছে, সেটা—সত্য, এখন সত্যই ধর্ম্ম। এখন আর হিন্দুরাজা নাই যে, কলির দমন করিবে।

মহানন্দ নামক এক ব্যক্তি বলিলেন—"আচ্ছা বাবা! জীবের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যায় কিন্তু ধর্ম্ম ত' নষ্ট হয় না?"

বামা। তা কি হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে যে আর কিছুই থাকে না, ধর্ম্ম-কর্ম্মই তো পরজন্মে মানুষকে ভালমন্দের পথে নিয়ে যায়। ওই যে পণ্ডিতেরা কি একটা শ্লোক বলে গো!

মহানন্দ। আজ্ঞে হাঁ! শাস্ত্র বলেন—"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"

বামা। হাততালি দিয়া, হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক, আমার তত কিছু মনে থাকে না বাপু! তবে এইমাত্র বলি—ধর্ম্ম ছাড়িলে মানুষের আর কিছু থাকে না, সে জন্তুর সমান হয়ে যায়; যেরূপেই হ'ক ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে হবে।

রঘুনাথ নামে আর একজন ভক্ত বলিলেন—"বাবা! এই কত লোক ধর্ম্মের ভাণ করে থাকে, বকধার্ম্মিকের মত লোক

দেখাইবার জন্য নামাবলী গায়ে দেয়, চন্দনে দেহ চর্চ্চিত করে, সদাই ধর্ম্মকথা মুখে বলিতে থাকে, কেহ কেহ বা চিতাভস্ম মাখিয়া সাধু সাজে, এরূপ লোক দেখান ধর্ম্ম করা কি ভাল ?"

বামা। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, বেশী আড়ম্বর ক'র্‌লে পণ্ড হয় বটে, কিন্তু ঐ রকম ভাণ ক'রেও সময়ে সময়ে অনেকের ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হ'য়ে, উদ্ধার পেয়েছে—তাহাদের একটা গল্প শোন্ ঃ—

একটা রাজার বাড়ীতে একজোড়া মেথর খাট্‌তো। এক-জোড়া কি জানিস্—তারা স্ত্রীপুরুষে। রাজার পাইখানা মেথর পরিষ্কার করে, আর রাণীর পাইখানা তার মাগ পরিষ্কার করে। মেথরের মাগটী ভয়ানক সতী, ছোট জাৎ হলে কি হবে, অমন সতী ভদ্রলোকের ঘরেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—স্বামীঅন্ত জীবন। প্রত্যহ মেথরের পাদক জল না খেয়ে মাগী জলগ্রহণ করে না। ভাতারকে সে দেবতার চেয়েও বড় মনে ক'র্‌তো। একদিন মাগীর হঠাৎ অসুখ হ'ল, সে আর কাজে আস্‌তে পার্‌লে না, কাজেই মিন্সেকে দুইটী পাইখানাই পরিষ্কার ক'র্‌তে হ'ল। একদিন সে রাজার পাইখানা খেটে, রাণীর পাইখানা খাট্‌তে গেল। মেথরটা যখন দরজা দিয়ে ভিতরে যাবে এমন সময় রাণী পাইখানা হ'তে বাহির হইয়া অন্দরে গমন করিলেন। মেথর তাঁহাকে দেখ্‌তে পেলে। সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে সে একেবারে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়্‌লো, তার আক্কেল গুড়ূম হ-য়ে গেল। সেত এরূপ রূপ কখনও দেখে নাই, এ রূপ যে তাহার স্বপ্নেও

কখন উদয় হয় নাই। সে মনে করিতে লাগিল—মানুষের স্ত্রীর কি এত রূপ হ'তে পারে? আহা, যার এমন মাগ আছে, তার আর ভাবনা কি? যা হোক্—আমাদের এ রাজাটাই ধন্য, তার ধনদৌলত যত থাক্ আর নাই থাক্, এমন মাগ থাক্‌লে তার আর কিছুই দরকার নেই। এইরূপ মনে করে মেথরের মন খারাপ হ'য়ে গেল। সে এক রকম ক'রে পাইখানা পরিষ্কার ক'রে বাহিরে এলো, মনে আর তার তিলমাত্র সুখ নেই, সে মনে ক'রেছে—এরূপ স্ত্রী যার নাই, তার জীবনই বৃথা, তার জীবনধারণ করার দরকার নেই। দূর হ'ক ছাই আর জীবনে দরকার কি? গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় জলে ডুবে মরা আমার ভাল। মেথর উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গেল। অন্য দিন যে সময় সে বাড়ী যায়, আজ তার চেয়ে অনেক দেরি হ'য়ে গেল। এদিকে মেথরাণী স্বামীর আস্‌তে দেরি দেখে, বড়ই কাতর হ'য়ে ঘর-বার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। একবার বাহিরে আসে, আবার ঘরের ভিতর যায়। অসুখ শরীর হ'লেও কষ্টে স্বস্টে সে রান্না ক'রে রেখেছে; মেথর এসে খেলে তারপর সেই পাতে সে খাবে। বেলা তিন্‌টে বাজে, অসুস্থ শরীরে আজ কয়েক দিনের পর পথ্য ক'র্‌বে, কিন্তু স্বামী না খাইলে ত' সে খাইতে পারে না, এতে তার প্রাণ যাক্ আর থাক্। আশা-পথ চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে প্রায় সন্ধ্যার সময় মেথর বাড়ীতে এলো। মেথরাণী সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করে রেখেছিল কিন্তু মেথর সেদিকে দেখিল না। সমস্ত দিন অনাহার তথাপি কিছুই খাইল না। বিছানায় শুইয়া পড়িল। মেথরাণী প্রমাদ গণিল—সে মনে

করিল—স্বামীর বুঝি কোন অসুখ ক'রেছে। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে বোধ হয় তিনি বড় কাতর হ'য়েছেন। সে সমস্ত ফেলে দুর্ব্বল শরীরে তার সেবা ক'রতে লাগ্‌লো, আর জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগ্‌লো—"হাঁগা, তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে ?'

মেথর অনেকক্ষণের পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আমার আর অসুখ বিসুক কি, এখন যেতে পার্‌লেই বাঁচি, আর এমন ক'রে গুঘেঁটে ঘেঁটেই যদি জীবনটা গেল, তবে আর বেঁচে সুখ কি ? যে রকমে হ'ক এ জীবন শেষ ক'র্‌ব !" এই ব'লে সে বালিসে মুখ গুঁজে রহিল।

মেথরাণী কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে বলিল—দেখ যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল ভোগ ক'রতে হয় ; তার জন্যে আর কষ্টবোধ ক'র্‌লে কি হবে, আমরা যদি ভাল কাজ ক'র্ত্তুম তাহ'লে কি আর এমন কাজ ক'র্‌তে হ'তো। যার যেমন অবস্থা—তাতে সুখে থাক্‌লে, দেবতা রাজী হবেন, পরজন্মে ভাল হবে।

মেথর রাগতস্বরে বলিল—আরে রেখে দে তোর পরজন্ম, সে এখনও কত দেরি, অমন মাগ যার নাই, তার আর জীবনে দরকার নাই, আমি শীঘ্র এই জীবন নষ্ট ক'র্‌ব। মেথরাণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাতরস্বরে বলিল—"দেখ, আমি ত' কিছুই বুঝিতে পারছি না, কি হ'য়েছে, বলো, আমি কোন দোষ ক'রেছি কি ? তাই তোমার রাগ হ'য়েছে, কি হ'য়েছে বলো।"

মেথর। তুই দোষ ক'র্‌বি কেন, আমার অদৃষ্টের দোষ তা না

হ'লে অমন মাগ পাওয়া যায় না ? রূপজমোহে মুগ্ধ হইয়া মেথর প্রলাপ বকিতে লাগিল।

মেথরাণী অবাক্ হইয়া বলিল—"মাগ পাওয়া যায় না, ও কি কথা ?"

মেথর। আজ হঠাৎ রাণীর পাইখানা পরিষ্কার ক'র্‌তে গিয়ে, সেই চেহারা দেখ্‌লুম, আহা কি চোক্, কি মুখ, কি ভ্রূ, রূপের জ্যোতিই বা কি, যেন অপ্সরী ; এমন নারী যার স্ত্রী না হ'লো তার আর জীবনে দরকার কি ? এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল।

এইবার মেথরাণী সমস্তই বুঝিতে পারিল। তার স্বামী যে রূপজ মোহে মত্ত হইয়াছে, পতঙ্গ আগুনে পড়িবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে বলিল—"দেখ, বামন হয়ে চাঁদ ধ'র্‌তে তোমার ইচ্ছা কেন, এ যে এজীবনে অসম্ভব ?"

মেথর। অসম্ভব ব'লেই ত' জীবন আর রাখ্‌বো না ; আমি জলে ডুবে ম'র্‌ব ব'লে ঠিক ক'রেছি। মেথরাণী দেখিল কয়েকদিন রাণীর পাইখানা পরিষ্কার করিতে না যাইয়া, তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে! কিন্তু কি করিবে, পতিব্রতা স্বামীকে অনেক বুঝাইল, অনেক উপদেশ দিল, শেষে বলিল—"আচ্ছা, তোমার আর পাইখানা খাট্‌তে গিয়ে কাজ নাই ; তুমি ঘরেই থাকো, আমিই কাল থেকে সমস্ত ক'র্‌বো ; এবং তোমার আশা মিটাইবার চেষ্টাও দেখিব, এ সব তো আর একদিনের কাজ নয় ?"

মেথরাণী মনে মনে বলিল—দেখি, ভগবান্ এই আশার পরিণাম কোথায় মেটান। নিশ্চয়ই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে।

অনেক সময় মেথরাণী মেথরের অনেক অন্যায় আশা পূর্ণ করিয়াছে; এখন এ কাজেও যখন সে আশা দিতেছে, তখন আর ভাবনা কি? মেথর আনন্দে আটখানা হইয়া বলিল,—"ভেলা মোর ভাইরে, চল্ তবে ভাত খাইগে, আহা! দু'তিন দিন খাওয়া হয়নি, অনেক রাত হ'য়েছে, চ ভাত খাইগে।" এই বলিয়া সে মেথরাণীর হাত ধরিয়া আহার করিতে গেল।

তাহার পর দিবস হইতে মেথরাণীই কাজ করিতে যায়, মেথর গৃহে থাকিয়া মেথরাণীর কাজকর্ম্ম করে। মেথরাণী প্রত্যহ রাণীর পাইখানা পরিষ্কার করিতে যাইয়া নয়ন-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। রাণী দুইতিন দিন মেথরাণীর ভাবগতিক দেখিয়া একদিন বলিলেন—"হাঁরে রাণী, তুই রোজ রোজ এখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিস্ কেন, তোর কি কিছু বল্‌বার আছে?"

বলা বাহুল্য, মেথরাণীকে সকলেই রাণী বলিয়া ডাকিত। রাণী বলিল—"মা! আমার অনেক বল্‌বার আছে; কিন্তু সে অতি খারাপ কথা, তোমার কাছে ব'ল্‌তে ভয় হয়।" রাজ-রাণীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন—"যত খারাপ কথাই হউক, আমি তোকে অভয় দিচ্ছি, তুই বল্।"

মেথরাণী তখন নির্ভীকচিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা রাণীর নিকট প্রকাশ করিল এবং বলিল—"মা! মেয়ে মানুষের যদি

স্বামী এমন ক'রে পাগল হ'য়ে যায়—তা হ'লে উপায় কি মা ? এই বলিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইল। মেথরাণী যে খুব সতী, রাণী তা ভাল জান্‌তেন। অপর কেহ এ কথা বলিলে—হয় তো তাহার গর্দ্দান লইতেন ; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব না হ'লে ত' রাণী হওয়া যায় না, মেথরের হৃদয়ে উচ্চাশার বীজ কেন এমন করিয়া অঙ্কুরিত হইল, ইহার মধ্যে ভগবানের অভিপ্রেত কোন কার্য্য অবশ্যই নিহিত আছে। ইহা ভাবিয়া তিনি আরও অনেকক্ষণ মেথরের দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন—দেখ্‌ রাণি ! আমার অন্দরে মহারাজ ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশের হুকুম নাই ; পরপুরুষ দেখাও নিষেধ, তবে সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার নিকট যাইতে পারা যায়। তুই এক কাজ কর, তোর মেথরকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া গঙ্গার তীরে রাখিয়া আসিস্‌ এবং রাত্রে যখন সকলে নিদ্রা যাইবে, সে সময় কিছু কিছু খাওয়াইয়া আসিবি, তাহা হইলে ক্রমশঃ লোকমুখে উহা প্রচার হইয়া তাহার আশা পূর্ণ হইতে পারে। এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া রাণী অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মেথরাণীও সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে গমন করিল ও স্বামীকে রাণীর সমস্ত উপদেশ বলিয়া দিল।

রাণীকে পাইবার জন্য মেথর সমস্ত করিতে প্রস্তুত। এমন কি জীবন দানেও কুণ্ঠিত নয়—সন্ন্যাসী সাজা ত' অতি তুচ্ছ। পরদিন রাণীর উপদেশ মত কার্য্য হইল। মেথর সন্ন্যাসী সাজিয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিল। মেথরকে দেখিতে মন্দ ছিল না—

তাহার উপর সন্ন্যাসী-বেশ, বেশ ভালই দেখাইল! এইরূপে সে কপট যোগী সাজিয়া যোগ-সাধনা করিতে লাগিল।

হিন্দু ধর্ম্মের নামে গলিয়া যায়। বিশেষতঃ হিন্দু-রমণীগণ এ বিষয়ে আদর্শ, তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের তুলনা নাই। গঙ্গাস্নানা-
মণীবৃন্দ ক্রমশঃ ঐ সন্ন্যাসী বেশধারী মেথরের নিকট গতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহাকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া তাহার চরণ-ধূলি লইতে আরম্ভ করিলেন। মেথর দেখিল —সে যখন তাহার স্বকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিত, তখন তাহাকে দেখিলে লোকে নাসিকায় বস্ত্র প্রদান করিয়া সাত হাত দূরে পলায়ন করিত, আর এখন ভদ্র-বংশের স্ত্রীলোকেরা অম্লানবদনে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। সে ত' ভণ্ড যোগী, কিন্তু যাহারা যথার্থ এ পথের পথিক, তাহাদের মর্য্যাদা কত অধিক? আমি কপটতা করিয়া এই পথে আসিয়াছি, তাহাতেই এই মান; না জানি যাহারা প্রকৃত সাধু, তাঁহারা লোকের নিকট ও ভগবানের নিকট কত প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছেন! কপটাচারী মেথরের মন প্রাণ ক্রমশঃ বিচলিত হইতে লাগিল। এই পন্থাই যে ইহ ও পরকালে ধন্য হইবার প্রকৃত পন্থা, তাহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। যত দিন যাইতে লাগিল, তত ভাল ভাল ব্রাহ্মণমণ্ডলী পর্য্যন্ত এই মহাতপা সাধুর নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। সাধু কখন আহার করেন, কখন নিদ্রা যান, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অহোরাত্র সকলেই তাঁহাকে তপোমগ্ন দেখিয়া থাকেন। এই জন্য সাধু আপামর

সাধারণ সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—তাঁহারা এরূপ অকপট সাধু আর কখনও দেখেন নাই।

কথা যত রাষ্ট্র হইতে লাগিল, সাধু-সকাশে ততই লোক-সমাগম হইতে লাগিল। সাধুর নামে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এই সাধু-সংবাদ ক্রমশঃ রাজভবনে গিয়া উপস্থিত হইল। মন্ত্রী শুনিবামাত্র একদিন ঐ মহাতপা সাধু-সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইতে আগমন করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং ছল ছল নয়নে বলিতে লাগিলেন—বাবা! তোমার পদার্পণে আজ আমাদের রাজ্য পবিত্র হইল, আমরাও পবিত্র হইলাম। এই বলিয়া যাহাতে সাধুর কোন কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া পুনরায় পদধূলি গ্রহণানন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন কথা-প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় রাজার নিকট এই সন্ন্যাসীর আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া একদিন স্বয়ং সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নানা প্রকারে স্তব-স্তুতি করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—আজ আমার জন্ম সফল, আপনার ন্যায় পবিত্রাত্মা সাধুর পদস্পর্শে আমার রাজ্য পবিত্র ও কুল পবিত্র হইল। এই বলিয়া রাজা ভক্তি-গদগদ হৃদয়ে পুনরায় সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান

করিলেন। অত্যকার ঘটনা দেখিয়া মেথর একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, যাঁহার বিষ্ঠা বহন করিবার জন্য আমি জীবনধারণ করিয়াছি, আজ সেই রাজাই আমার পদতলে রাজমুকুট রক্ষা করিলেন, পদধূলি জিহ্বা স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, আপনার দেহ-মন-প্রাণ, বংশ ও রাজ্য পবিত্র হইল, বোধ করিলেন। এখন বুঝিলাম, মানব-জীবনে ভগবদারাধনা করিবার তুল্য মহাগৌরবের কার্য্য ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। ভগবদারাধনা-পরায়ণ ব্যক্তিই সকলের শীর্ষস্থানীয় ও জগতের মুকুটমণি! ভগবানের কৃপায় এই দিন হইতে মেথরের অন্তর হইতে জগতের সমস্ত মলিন ভাব—স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-বৈভব, গৃহ-দ্বার সমস্ত তিরোহিত হইয়া, তাহার স্থানে যোগিজনবাঞ্ছিত, মানবের একমাত্র ঈপ্সিত, চিরারাধ্য মহাভাবের আবির্ভাব হইল। মেথর ক্ষণে ক্ষণে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিল! তখন তাহার মন আর সামান্য বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট হইল না; তাহার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল, মন এই জগতের সামান্য প্রেম ভুলিয়া ঐশ্বরিক প্রেমে মত্ত হইবার জন্য লালায়িত হইল। যে রূপজ মোহে, যে জাগতিক প্রেমের প্রসঙ্গে তাঁহাকে এই পথে আনিয়াছিল, এখন মেথর আর সে প্রসঙ্গ ভাবিতেও ঘৃণা বোধ করিতে লাগিল। সে এখন অনন্ত প্রেমের অধিকারী হইতে চায়; যে প্রেমে কলহ নাই, যে প্রেমে হিংসা-দ্বেষ নাই, যে প্রেমে অশান্তির অনলে পুড়িয়া মরিতে হয় না, যাহাতে বিচ্ছেদের নাম গন্ধ নাই, মন-প্রাণ, এখন তার সেই অগাধ, চিরশান্তিময় প্রেম-

সাগরে অবগাহন করিয়া আপন-হারা হইতে যাইতেছে, কাজেই তাহার বাহ্যিক বিষয়ে আর রতিমতি থাকিবে কেন? মেথর বাহ্যিক চৈতন্য-বিরহিত হইয়া চৈতন্যময়ের চৈতন্যে মিশিয়া গিয়াছে;—পার্থিব কোন বিষয় আর তাহার বোধগম্য হইতেছে না। শর্ব্বরীর শেষ ভাগে মেথরাণী আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তথায় উপস্থিত হইল। রজনী গভীর গম্ভীর জনমানবের সমাগম নাই, এমন কি রাত্রিচর জীবজন্তুগণেরও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। উপর্য্যুপরি এই কয়েকদিন এমন হইতেছে যে, মেথরাণী আসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ডাকিলে তবে স্বামীর সাড়া পাইত। আজ কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া ডাকিয়াও তাঁহার উত্তর পাইল না। শেষে গাত্রস্পর্শ করিয়া ডাকিল—নাথ! আমি এসেছি, খাদ্যদ্রব্য এনেছি; আহার কর—রাত্রি প্রায় শেষ হয়।

মেথর নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় সহসা চমকিত হইয়া জাগ্রত হইল এবং নিজ স্ত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া প্রণয়-সোহাগভরে বলিল—রাণি! আমার হৃদয়-রাজ্যের দেবীপ্রতিমা! আমি অধম, এত দিন তোমায় চিনিতে পারি নাই; তোমার ন্যায় দেবী-প্রতিমার মহাপুণ্য-ফলেই আজ আমি বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি। আহারে আর আমার তত রুচি নাই; না খাইয়াও কোন কষ্ট অনুভব করিতেছি না। তবে তুমি যাহা আনিয়াছ—তাহা ত' অমৃত, দাও অমৃত খাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি। এই বলিয়া যাহা পারিল—তাহাই আহার করিল। পাঠক! স্বামীর পূর্ব্বে সতী-

স্ত্রী কখনও পান-ভোজন করে না; মেথরকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া অবধি মেথরাণীও এইরূপে প্রত্যহ সমস্ত দিবস ও প্রায় সমস্ত রাত্রি উপবাসী থাকে, আজ এখনও সে জল পর্য্যন্ত মুখে দেয় নাই।

বাঙ্গালার মা সকল! তোমরা ইহাকে নীচকুলোদ্ভবা মেথরাণী বলিয়া ঘৃণা করিও না, বরং ইহাকে শিরোভূষণ করিয়া ইহার আদর্শ অনুধাবন করিও—পরকাল নিস্তারের আর ভাবনা থাকিবে না। মেথরাণী সেদিনকার মত স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া প্রভাত হইলে, লোক-জানাজানি হইবার ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রজনী-দেবী নীচ-কুলোদ্ভবা এই মেথরাণীর সতীত্ব-জ্যোতিঃ অনুভব করিয়া যেন বিষাদে ক্রমশঃ মলিনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র এতক্ষণ আকাশে বসিয়া মরজগতের এই অদ্ভুত সতীত্ব-দীপ্তি দেখিয়া লুব্ধ অন্তঃকরণে আপন রমণী-গণকে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করাইবার জন্য যেন ধীরে ধীরে আপন গৃহাভিমুখে গমন-তৎপর হইলেন। পরক্ষণেই ভানূদয় হইল।

রাজা সাধু-সন্দর্শন করিয়া আসিয়া রজনীযোগেই নিজ রাণীর নিকট ঐ সাধু সম্বন্ধে, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে নানা অলঙ্কারে গল্প করিয়াছিলেন। রাণী মনে মনে হাসিয়া প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই রাজার নিকট বলিলেন—তবে আমার ত' পুত্র-কন্যা কিছুই হইল না, আর এত চেষ্টা, এত যাগ-

যত্নও ত' করা হইল—কোন ফল হইল না। এক্ষণে আমি একবার নিভৃতে সেই মহাপুরুষের নিকট যাইয়া বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। রাজা অকপট-চিত্তে বলিলেন—তাহাতে আর ক্ষতি কি, সেরূপ মহাতপা সাধুর নিকট যাইতে কোন আপত্তি নাই, তুমি অনায়াসে যাইতে পার। তাঁহার কৃপা হইলে মনোবাসনা সুসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে।

রাণী বলিলেন—অনুমতি করুন, আমি একাকিনী তথায় যাইব, আপনি আমার অন্দর হইতে সন্ন্যাসীর আসন অবধি ঘেরিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। রাজার অনুমতি ক্রমে তাহাই হইল। রাণীর অতুলনীয় রূপের কথা ত' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহার উপর আজ তিনি বর্ণনাতীত বেশভূষা করিলেন, নানাবিধ অনুলেপ, গন্ধ দ্রব্যাদি মাখিয়া, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া স্বর্গের অপ্সরীর ন্যায় শোভা ধারণ করতঃ নানা হাবভাবে মেথরকে পরীক্ষার জন্য সেই আচ্ছাদিত স্থান দিয়া একাকিনী গমন করিতে লাগিলেন। এ মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় কেহই লালসাবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে পারে না।

নয়নাভিরাম রূপ-লাবণ্যবতী রমণী-রত্নের রূপমোহে যখন যোগ-পরায়ণ যোগীশ্বর মহাদেব হতচেতন হইয়া যান; তখন তোমার আমার কথা ত' স্বতন্ত্র। কিন্তু যে পারে—এ লোভনীয় বস্তুকে যে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করিতে শিখিয়াছে—তাহার ত' কথাই নাই—সে তত্ত্বজ্ঞানের চরমসীমায় আরোহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে; এ জগতে তাহার তুল্য বীর-সাধক আর কেহ নাই

এরূপ ত্যাগ স্বীকারে দেবগণও যে তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন; —ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

রাণী সেই অপ্সরা-বিনিন্দিত মোহিনীমূর্ত্তিতে মেথরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রেমের সন্ন্যাসীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। রাণী বুঝিলেন—মেথরের কপটতা এখন যথার্থতায় পরিণত হইয়াছে। এখন সে আর বিষ্ঠা-বহন-কারী মেথর নাই। এখন সে যেভাবে পরিবর্ত্তিত, তাহাতে তাহার পদধূলি সত্যসত্যই আমাদের ন্যায় সংসার-মোহমুগ্ধ জীবের প্রার্থনার বিষয় হইয়াছে। রাণী আর কালবিলম্ব, করিলেন না, ডাকিলেন—মেথর, মেথর ও মেথর! তুমি যাহার জন্য এত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছ, যাহার জন্য সংসারের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছ, আজ তোমার সেই অভীষ্ট বস্তু নিকটে উপস্থিত। এখানে অপর কেহ নাই; এক্ষণে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, তাহা পূর্ণ করিতে পার। যে মেথর আজ মাসাবধি কাল যোগাসনে বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত, গাত্রে অগ্নিস্পর্শ করিলেও এখন যাহার সংজ্ঞা হয় না; মেথরাণী যাহাকে বারংবার ধাক্কা দিয়া ডাকিয়া চৈতন্য করাইয়া তবে আহার করাইয়া থাকে, আজ রাজরাণীর কেবল মাত্র মর্ম্মস্পর্শী বাণী হঠাৎ সেই মেথরের চৈতন্য সঞ্চার করিল; নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে সে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। যে মূর্ত্তি অহরহঃ চিন্তা করিয়া সে এখন বিশ্বারাধন মহামূর্ত্তি আপন হৃদয়-রাজ্যে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে; সেই অভীষ্টফল-প্রদায়িনী চরমপন্থা-প্রদর্শিনী দেবীকে সম্মুখে দেখিয়া "মাগো এতদিনে দয়া হইল" এই বলিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মহিমময়ী রাজরাণী অমনি শশব্যস্তে কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাহার মস্তকে, বদনে প্রদান করিলেন; অঞ্চল-বস্ত্রে ব্যজন করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল দেখিয়া রাণী পরীক্ষাচ্ছলে পুনরপি সেই বিষম বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—এখানে আমি একাকিনী আসিয়াছি; যদি ইচ্ছা হয়, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পার। মেথর যোড়হস্তে প্রেমাশ্রু-বিগলিত নেত্রে বলিতে লাগিল—মা! তুমি আমাকে যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার পথ দেখাইয়াছ, আমাকে যে পথে আনিয়া ফেলিয়াছ, সে পথে যে একবার আসিতে পারিয়াছে, মা! এ নশ্বর জগতের সমস্ত কাম্যবস্তু সে অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে। দেবী! ধন্য তোমার রাজ-বুদ্ধি; এ বুদ্ধি কি সামান্য মানুষে থাকিতে পারে? আজ মা! তোমার পাদপদ্মের ধূলিকণার বলে একজন নরাধম মহাপাপীর উদ্ধার সাধন হইল; মহিমাময়ী মা! আমি যে প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছি; কি ছার তাঁহার নিকট রমণী-প্রেম, আমি অপার্থিব প্রেমসাগরে ডুবিয়াছি, ইহাতে যে বর্ণনাতীত সুখানুভব করিতেছি, পার্থিব রমণী-প্রেম তাহার কণিকামাত্র দিতেও সক্ষম নহে। দেবী! পদধূলি দিন; আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ পাপিষ্ঠ সন্তান তোমার ঐ পদরেণুর সাহায্যে এ

পথে চির-সাফল্য লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে মা! আজীবন চিন্তা করিব। চিরজীবন কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তোমার চিন্তা অন্তর মধ্যে পোষণ করিয়া বলিব যে তুমিই আমার জীবমুক্তির প্রধান কর্ত্রী। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য; তুমি আমার গুরুর গুরু; তুমি আমার কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় জীবনপথের আলোক বর্ত্তিকা। তুমিই আমার পরকালের মুক্তিবিধাত্রী দেবী। মা—মা! পতিত সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর,—যেন আর পার্থিব সুখ-দুঃখে তাহাকে মজিতে না হয়। সাধু তাহার অভীষ্ট-দেবীস্বরূপা রাজরাণীর পদধূলি গ্রহণে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। রাণী স্তব্ধান্তঃকরণে মেথরের উচ্চাশার অভিনব পরিণতি এবং ভগবানের অপার করুণার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গমন করিলেন। পরদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরে সেই সন্ন্যাসীকে এবং গ্রামে সেই মেথরাণীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সন্ন্যাসীর অদর্শনে সকলেই অন্তরে দারুণ দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল।

বামাচরণ বলিলেন—দেখ বাপু! ভাণ করিয়া অস্পৃশ্য মেথর চিরতরে কেমন উদ্ধার হইয়া গেল! সকলেই গল্পটী শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। যে ভক্তটি সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন—তাহাকে সম্বোধন করিয়া বামাচরণ বলিলেন—কিগো বাবুটী! দেখ্‌লে এই মেথরের যথার্থ সুখলাভ হইল। সংসার সুখময়, ইহা ন্যায়দর্শনের মত। সুখ জিনিষটা দুঃখানুযুক্ত, এইজন্য গৌণরূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া ধরা উচিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখ নাশ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে

যাহাতে জন্ম না হয়, এরূপ কাজ করা উচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি —জন্মের হেতু প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই জন্মনাশের হেতু। কেননা জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মাইতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির হেতু কি?—দোষ! আসক্তি, বিদ্বেষ কিম্বা প্রমাদ-দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে সংসারাসক্ত জীবের প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল মোহকর বিষয়ও আবার মিথ্যা জ্ঞান হইতে উদ্ভূত; অতএব এই মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অন্য উপায় নাই। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। ঐ তত্ত্বজ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসেই পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে মতি রাখিয়া ভাণ করিতে করিতেও উহা মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে— ইহা ধ্রুব সত্য। বিশ্বাস ও ভক্তিবলে সাধনা কর্‌রে ব্যাটারা, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।

পাগল একস্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে আবার কি মনে হইল, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—দেখ বাবা! কর্ম্ম থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ভক্তি ও বিশ্বাস—তা হ'লেই নির্ব্বাণ মুক্তি। আমি মূর্খ মানুষ, অত তত্ত্ব কিছু জানি না, জান্‌তে চাইও না, আমি তারা বলে ডেকে আপনহারা হ'তে চাই। বাপুহে, এতে যে সুখ, তোর নির্ব্বাণের বাবাও সে সুখ দিতে পারে না। নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ কিরে বাবা—আমার তারা-মাই সব; মায়ের নামে হাস, নাচ, গাও আর বগল বাজিয়ে, ডঙ্কা মেরে মায়ের আদুরে ছেলের মত

যেখানে ইচ্ছা চলে যাও, যমের বাবাও তোমাকে আট্‌কাতে পার্‌বে না; তারামায়ের ছেলের নাম শুন্‌লে যম বেটা ভয়ে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপে। দেখ বাবা! আনন্দময়ীর আনন্দে সদা ডুবে থাক, কিছু ক'র্ত্তে হবে না—"আপ্‌সে সব হোগা।" এই বলিয়া পাগল আসব-পানে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন—সে প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিলে বাস্তবিক হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলাইয়া যায়, মহাপ্রাণতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। তখন সত্য সত্যই মনে হয়—তারা মাই সকলের মূল। তাঁরই কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র বিদ্যমান; তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। এত যে জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁর কৃপা না হ'লে হয় না। তারা-দাস বামার সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বামাচরণের ন্যায় সকলেই মা মা করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এ দৃশ্য অতুলনীয়—এ ছবি আঁকিবার আমার ক্ষমতা নাই।

বামদেব সর্ব্বদাই এইরূপ বালকের মত দায়িত্ববিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। হয়ত' মায়ের মন্দির চত্বরে—না হয় শ্মশানের আশে পাশে আর না হয় নিজের সিদ্ধাসনে বসিয়া আপন মনে প্রেম-বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কোন বাঁধাবাঁধির মধ্যে কেহ তাঁহাকে রাখিতে পারিত না। তিনি জানিতেন—যেখানে যত ভালবাসার বাঁধাবাঁধি—যেখানে যত দায়িত্বের আঁটাআঁটি—সেখানে ততই নিরানন্দ। অকারণ চিন্তার অনলে পুড়িয়া ততই হাড়কালী করিতে হয়; আসল কাজের কিছুই হয়

না, মানুষ-জন্মটা কেবল বৃথায় নষ্ট করিতে হয়। তাই তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছেন। তবে কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত আসিলে—খুব পরিচিত সেবক হইলে, তিনি তাহাকে ধরা দিতেন, তাহার কাছে আসিয়া আপনার মনে কত আবোল-তাবোল বকিতেন। সে কথার কোনও দৃঢ়তা, সে আলাপের কোনও গভীরতা ছিল না। ঠিক কচিছেলেটির মত মধুর হাসি শ্রীমুখখানিতে লাগিয়াই থাকিত, যাহা দেখিলে অতি-বড় পাষণ্ডও মুগ্ধ হইয়া যাইত। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এ ভাব দেখিয়া আর চরণ-ছাড়া হইতে পারিত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাগল ও পণ্ডিত।

আজ শারদীয়া সপ্তমী তিথি, মাতৃ-পূজার মহামাহেন্দ্রক্ষণ। প্রকৃতি আনন্দ-মুখরা, চির-পরাধীন বঙ্গবাসী এই কয়দিন যেন পরাধীনতা ভুলিয়া আনন্দে আত্মহারা। প্রকৃতির কোমলকোলে আনন্দের মধুর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানবের মনে অপার আনন্দ। বাঙ্গালা দেশে এ সময়ে অতি দীন-দরিদ্র মায়ের আগমনে ক্ষমতানুসারে আনন্দে দিন কাটাইতে চেষ্টা করে। এ সময়ে নির্জীব বাঙ্গালী যেন একটু সজীব হইয়া নানা প্রকার বৈষয়িক কাজ পরিত্যাগ করতঃ বাহ্যিক হউক বা আন্তরিক হউক, একটু ধর্ম্মময় কাজে বিব্রত থাকে। এই উপলক্ষে কেহবা পরিজন-বর্গের পোষাক পরিচ্ছদ কিনিতে ব্যস্ত থাকে। আর যাহার প্রতি মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, সে বিশ্বজননীর রাজীবচরণে গঙ্গাজল বিল্বপত্র দিয়া ধন্য হইবে বলিয়া তাহার আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। কেহ কেহবা বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকে। কেহবা এই সময় একটু অবসর পাইয়া আত্মীয়-কুটুম্বগণের সহিত বৎসরান্তে দেখা করিয়া আনন্দানুভব করিতে ব্যস্ত হয়। যে যে প্রকারের লোক, সে সেই প্রকার কাজে ব্যস্ত।

এ সময় ভারতের অধিকাংশ কর্ম্মক্ষেত্রই বন্ধ হইয়াছে! সকলে কিছুদিনের জন্য ছুটী পাইয়া যে যার স্থানে চলিয়া গিয়াছে। কনকপুরের বিদ্যালয়টীও বন্ধ হইয়াছে। অপরাপর শিক্ষকগণ আপন আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয় মনে করিলেন—আমি আর যাই কোথা? অর্থ ত' তত নাই, মাহিনাও সমস্ত পাওয়া গেল না; বেশী অর্থ খরচ না করিয়া দূরতর তীর্থে ত' যাওয়া অসম্ভব, তবে পূজার সময়টা বৃথা নষ্ট না করিয়া তারাপুর যাই। মায়ের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া এ কয়দিন বামাচরণের সহবাসে কাল কাটাইয়া জীবন ধন্য করিগে। কনকপুর তারাপুর হইতে বেশী দূর নহে। পণ্ডিত মহাশয় তারাপুরে আসিলেন এবং মায়ের পূজাদি করিয়া বামার অন্বেষণ করিতে চলিলেন। বামাচরণ সেদিন একজন ভদ্রলোক সহ জীবিত-কুণ্ডের সোপানে বসিয়া আছেন। পণ্ডিত মহাশয় নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন—"প্রণাম হই বাবা! আপনাকে দেখিবার জন্য এখানে এলাম; একটু চরণ-ধূলি দেন।"

বামাচরণ। আসুন, বাবা, কোথায় বাড়ী?

পণ্ডিত। বাবা, বেশী দূর নয়, এই জেলার কনকপুর গ্রামে, এখান হ'তে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ হইবে।

বামাচরণের নিকটে যে একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বামাচরণকে বলিলেন—"বাবা! ইনি একজন ভাল লোক। স্কুলের ছেলে পড়ান, পাশ করা পণ্ডিত।"

বামাচরণ। বেশ ভাল বাবা, পণ্ডিত বাবা, ভাল বাবা। আমি মূর্খ বাবা, পাশ টাশ কিছুই নেই।

(পণ্ডিত। আপনি যে পাশমুক্ত বাবা। অষ্টপাশ বা বন্ধন-মুক্ত, শিবস্বরূপ জীব। অন্য পাশে আপনার দরকার কি?)

বামাচরণ। তা পাশ না ফাঁস। যার যটা পাশ, তার তটা ফাঁস বা বন্ধন, এ কথা ঠিক।

অপর ভক্ত। তা কেমন ক'রে, বাবা! তাও কি কখন হয়?

বামাচরণ। আঃ মলো, কেমন ক'রে হয় তাও জান না? এই ডাক্তার মনে করে—আমি ডাক্তারি পাশ, হাকিম মনে করে—আমি এম-এ পাশ, রাজা মনে করে—আমি রাজত্ব চালনায় পাশ, যদি সদা সর্ব্বদা এটা পাশ পাশই মনে হ'তে লাগ্‌লো, তাহ'লে আমি "ভগবানের দাস" এই মনে কেমন ক'রে হবে? এই পাশ করা, দাস করাটায় বাধা দেয় বলেই বন্ধন, যার মনে তা না হয়—তার ভালই হয়।

পণ্ডিত। হাঁ বাবা একথা ঠিক বটে।

অপর ভক্ত। হাঁ কতকটা বুঝ্‌লেম্। দাস দাস মনে করাটাই সর্ব্বদা দরকার, পাশ পাপ মনে করার দরকার নেই?

বামা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—দরকার নেই! ওতে কি আছে, কেবল অহঙ্কার।

পণ্ডিত। সে কথা ঠিক, বাবা! আর এক মজার কথা জানেন কি? অনেকে বি-এ, এম-এ পাশ ক'রে আবার কুল-

গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে চায় না, বলে—আমরা পণ্ডিত হ'য়েছি, যারা আমাদের চেয়ে বিদ্যায় কম, তাদের কাছে ছোট হব কেন ?

বামাচরণ। তাইত' ব'ল্‌ছি রে, কেবল অহঙ্কার, তাদের লেখাপড়া শেখা হয়নি, তারা আকাট মূর্খ, কেননা "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং," বিদ্যা শিক্ষাটা ছোট হবার জন্যেই। লোকে স্বভাবতঃই নিজেকে বড় দেখে, সেই অহঙ্কার বা অবিদ্যাটাকে নাশ করিবার জন্যই বিদ্যা বা বিনয়ের দরকার। লেখাপড়া শিখে যদি সে নিজেকে খুব বড়ই মনে করে, তবে তার বিদ্যা শিখে জ্ঞান হ'য়েছে কই ; তাকে ত' অবিদ্যায় ধ'রে র'য়েছে।

পণ্ডিত। তবে ছোট হয়ে দীক্ষা নেওয়ায় কোন দোষ নাই।

বামাচরণ। কিছু না। ছোট না হলে কি বড় হওয়া যায়! ছোটই ত' বড় হয়। আর এক কথা হচ্ছে কি, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ী যায় ; তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" যখন বেশী জ্ঞান হবে, তখন গুরু আর ইষ্ট এক হ'য়ে যাবে ; তখন সে বল্‌বে—চাঁদা মামা সকলেরই মামা। কে কার গুরু ! ভগবান্ সকলেরই গুরু।

পণ্ডিত। আচ্ছা প্রভু ! দীক্ষা নেয়াটা তবে সকলেরই দরকার কেন ?

বামাচরণ। দরকার বলে দরকার খুব দরকার ক, খ না শিখে কি একেবারে বড় বই পড়িতে পারা যায়। মন্তোর গ্রহণ করা দরকার। মন—তোর = মন্ত্র ! তোর মন নানাদিকে ঘুরে বেড়িয়ে বারফট্‌কা হয়ে প'ড়েছে, সে আর তোর নেই ; তাকে

তোর নিজের করবার জন্যে, কেবল বশে রাখবার জন্যে, মন্তোর নেওয়া দরকার। গুরু-মন্তোর জপ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তোর মন, যেমন পর হ'য়ে গেছলো, সে আবার তোর হ'য়ে পড়বে। মন তোর না নিজের হ'লে ত' আর কিছু কাজ হবে না?

পণ্ডিত। আচ্ছা বাবা! গুরুমন্ত্র জপ ক'র্লেই ত' সব হ'তে পারে?

বামাচরণ। তুই কলির জীব, আর কি করবি, "জপাৎ সিদ্ধিঃ" জপ কল্লে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিলাভ করা যায়, বেশী বিদ্যাবুদ্ধি দরকার করে না।

পণ্ডিত। কত জপ রোজ ক'র্ত্তে হবে?

বামাচরণ। একটা সঙ্কল্প ক'রে, তারপর ক্রমে ক্রমে বাড়াতে হবে, তা'হলেই মনের দৃঢ়তা আস্‌বে; তা'হলেই ভক্তি ও বিশ্বাস আপনি এসে পড়বে। কাজ কল্লে তবে ত' ফল; চাক্‌রি না কল্লে কি খেতে পাস্? তর্‌তে চাস্‌তো তাঁর কাজ কর, তবে ত' তিনি ফল দেবেন। কাজ না ক'রে ফলের আশা করা যায় না।

পণ্ডিত। যত বেশী জপ করা যাবে, ততই বুঝি শক্তি বাড়বে?

বামাচরণ। হাঁরে হাঁ, কেবল শুন্‌লে কি হবে, করে দেখনা, তা'হলেই জান্‌তে পারবি।

পণ্ডিত। ইষ্টমন্ত্র জপই তবে সিদ্ধিলাভের উপায়?

বামাচরণ। সে কথা আর বেশী বল্‌তে হবে কেন শ্লো,

নির্জ্জনে ব'সে কেবল জপ ক'রো, আর মায়ের নাম ক'রে কেবল কাঁদ, তা'হলেই মায়ের কোলে উঠ্‌তে পার্‌বে ?

অপর ভক্ত। বাবা! আপনি তাঁকে দেখ্‌তে পান ?

বামাচরণ। দেখ্‌তে পাওয়া কি, যারা হারায় তাদের খুঁজে দেখ্‌তে হয়, আমি ত' হারাইনি, আমি চবিবশ ঘণ্টাই ত' মায়ের কোলে শুয়ে আছি; আমি যে মায়ের পাগল ছেলে, পাছে কোথাও হারিয়ে গুলিয়ে যাই ব'লে, মা বেটী আমায় কাছ ছাড়া করে না। "তোমরা বলো, আমি একা, কিন্তু নইরে একা, শুয়ে আছি আমি মায়ের কোলেরে।" এই বলিয়া পাগ্‌লা উঠিয়া নাচিতে লাগিল, ভাবে প্রমত্ত পাগলের সেইরূপ তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাঁহারা পবিত্র হইতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বামা ভাবমগ্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল মুদিত-নেত্র হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। ভক্তগণ নিজ উত্তরীয় দ্বারা সেই পবিত্র অশ্রু ও তাঁহার সেই পবিত্র দেহ মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। ভক্তগণ তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

বামাচরণ কিয়ৎক্ষণ পরে হো হো করিয়া হাসিয়া আপনা আপনি বলিলেন—"তুমি পাষাণী, খিদের সময় খেতে দাও না, তাইত' এত রোগা হ'য়ে যাচ্ছি, ব'ল্‌ছো ত' বামা! তুই রোগা হ'য়ে

যাচ্ছিস্ কেন? কিন্তু তুমি তার জন্যে কি ক'চ্ছো, ছেলের জন্যে মাইত' সব করে; যা ক'র্ত্তে হয় ক'রো; তুমিই ত' কর্‌বার কর্ত্তা; ছেলে ত' পাগল"—এই বলিয়া হাততালি দিয়া বলিলেন —"আমি মা তোর পাগল ছেলে, খেতে শুতে যাই গো ভুলে।" আমি আমার জন্যে কিছু করি না, যা করি তোর জন্যে। এইবার বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বামাচরণ চাহিয়া দেখিলেন, ভক্ত দুইজন তখনও সমান ভাবে বসিয়া আছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—তো শালারা এখনও ব'সে আছিস? ঘর যাবিনি নাকি?

পণ্ডিত। আপনাকে দেখ্‌লে ঘর দোর, ছেলে পুলে আর মনে থাকে না; আমাদের মায়াই ত' হ'য়েছে যত কাল, মায়া ত্যাগ ক'র্ত্তে না পারলে তো কিছু হবে না?

বামাচরণ। ওরে শালারা! মায়া ত্যাগ ক'র্‌বি কি? মায়াই ত' মা; যার মায়া নেই সে ত' মানুষ নয়, সে রাক্ষস, মায়া ত্যাগ করিলেই ত' মানুষ মানুষ থেকে খারিজ হ'য়ে গেল; মায়া না থাক্‌লে জগৎ থাক্‌বে না; মায়া ত্যাগ করা ত' পতিত হবার লক্ষণ?

পণ্ডিত। সে কি বাবা; মায়া থাক্‌লেই ত' মায়ের কাজ করা যায় না।

বামাচরণ। মায়া থাক্‌লেই মহামায়ার কাজ ভাল ক'রে করা যায়। মায়া রাখ্‌তে হবে, তবে তাকে জয় ক'রে রাখ্‌তে হবে। তার বশে যাবে না। তোর ছেলে-পিলে কষ্ট

পাচ্ছে ; তাদের ভাল ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'র্‌বি,—এ সকল দয়া মায়া মানুষেই থাকে ; যার না থাকে, সে মানুষ নয়। ছেলের বা অন্য কারুর অসুখ ক'রেছে, তার প্রতি দয়া-মায়া প্রকাশ ক'রে খুব চেষ্টা কল্লে, তাতে সে বাঁচলো না, মরে গেলো ; তখন অভিভূত না হ'লেই হ'লো, তা'হলেই মায়াকে জয় করা হ'লো ; তা না হ'লে একজন কষ্ট পাচ্ছে, তুমি দেখেও মায়া ত্যাগ ক'রে চলে গেলে। তা হ'লে তুমি কি মানুষ ? তুমি তাকে ভাল ক'র্‌বার জন্যে চেষ্টা ক'র্‌বে, তারপর তার কপালে যা আছে—তাই হবে। বাঁচান বা মরাণোর কর্ত্তা তুমি নয় ?

পণ্ডিত। সে কাজে ত' তা হ'লে বৃথা সময় যাবে ?

বামাচরণ। বৃথা যাবে কেন গো ! কর্ত্তব্যকর্ম্মই যে মহাধর্ম্ম। আর সে কাজ ত' মায়েরই কচ্ছো ; মা ছাড়া ত' কিছুই নাই। মায়া ত্যাগ নয়, মায়া জয় ক'র্ত্তে হবে। তা হলেই ত' তুমি মহামায়াকে পাবে। বামাচরণের এই সরল উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ মোহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইতে লাগিল। আজ বিজয়া দশমী, নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক লোক সিদ্ধি ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মন্দিরে আসিয়া তারা দেবীকে ঐ সকল উৎসর্গ করিয়া দিল এবং বামাচরণের নিকট আসিয়া তাহা প্রদান করিল। বামাচরণ নিজে সেই উৎসর্গীকৃত সিদ্ধি উদরস্থ করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন। এইরূপে সে দিনকার রজনী সেই মহাপুরুষের সঙ্গে ভক্তগণের বেশ সুখে অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে

ভক্তগণ গাত্রোত্থান করিয়া বামাচরণ সমীপে উপবেশন করিয়া বলিলেন—প্রণাম বাবা, তবে এখন আমরা আসি! এবার আপনার সঙ্গে আমাদের যথার্থ বিজয়ার উৎসব করা হইয়াছে।

বামাচরণ। মায়ের আবার বিজয়া কি বাবা? ভক্ত তিনদিন প্রাণ-ভরে মাকে পূজো করে, এত তন্ময় হয় যে, আর বাহ্যিক ভাব তাদের ভাল লাগে না। তাই মানস সরোবরে মাকে ডুবিয়ে রাখে—এই হ'ল বিজয়া বাবা। নতুবা মহামহিমময়ী মাকে কি কোন নদীতে ডুবাতে পারা যায়? ত্রিভুবন জোড়া মা আমার এত বড় যে জগতের কোন নদীতে বা সমুদ্রে তাঁকে ডুবাতে পারা যায় না। আবার তিনি ভক্তের কাছে এত ছোট যে তাঁর হৃদয়-নদে ভক্তির জলে মা আপনি হাবু ডুবু খান—এই বিজয়া।

ভক্তগণ।—বাবা! এবার পূজার ছুটীটা বেশ কাট্‌লো; এরূপ দয়া যেন সব সময় সমভাবে থাকে।

বামাচরণ।—দয়া টয়া সব মার বাবা, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এই দেখ সব সেই মাগীর খেলা, মাগীর আপ্ত-ভাবে গুপ্ত লীলা।

ভক্তগণ বামার পদধূলি গ্রহণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন—বাবা! তবে এখন আসি।

বামাচরণ। বেশ, বাবা এস।

ভক্তগণ তাঁহার সেই আনন্দময় পবিত্র মূর্ত্তি মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম ও শক্তি।

বামাক্ষেপা প্রায় সমস্ত দিবস শিমুলতলায় বসিয়া কাটাইতেন। কখন কিরূপ খেয়াল লইয়া থাকিতেন, তাহার স্থিরতা ছিল না। কখন বা বৃক্ষের সহিত কথা কহিতেছেন, কখন বা বৃক্ষস্থিত কাকগুলিকে হাততালি দ্বারা তাড়াইয়া দিয়া নৃত্য করিতেছেন—এই ভাব। ক্ষেপার ভাবের কখন অভাব হইত না। সেই জটাজূটধারী চিতাভস্ম-বিমণ্ডিত, অজিনাসীন সাধকপ্রবরকে দূর হইতে সাক্ষাৎ দ্যুলোকাগত সহস্ররবি-রশ্মিবিজড়িত মহাদেবের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রায়ই তারামায়ের মন্দিরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পুত্র যেমন মায়ের নিকট কিছু আব্দার করিবার জন্য গমন করে এবং মা কাজে ব্যস্ত থাকিলে যেমন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, বামাও সেইরূপ অপেক্ষা করিতেন। তিনি অপর সকলের মত দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন না। ক্ষেপা যখন মন্দিরে উপস্থিত হইতেন, তখন পাষাণময়ী মূর্ত্তি যেন প্রাণময়ী হইয়া তাঁহার সহিত কত কথা কহিতেন। মাতা-পুত্রের সে কথা আর কেহ বুঝিতে পারিত না। ক্ষেপা কিন্তু সে কথায় অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন করিত, কখন বা হাসিতে

হাসিতে বলিত—তুই বেটী বড় বদ্। এই বলিয়া মার পানে চাহিয়া হাসিতেন। বামার হাসিতে তারামার বদন প্রফুল্ল হইত, বামা কাঁদিলে দেবীর মূর্ত্তি যেন কতই বিষাদময়ী বোধ হইত, মা যেন পুত্রের দুঃখে কাতর হইতেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আদুরে ছেলের মত সেই পাষাণ-নির্ম্মিত তারামার মুখে চপেটাঘাত করিতেন। ক্ষেপার এই সকল ভাব দেখিয়া সকলেই মোহিত হইত। তিনি মন্দিরে মায়ের নিকট নানা কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, পথে আবার কোন কথা মনে পড়িলে পাগল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়া সেই কথাগুলি আবার মাকে বলিয়া আসিতেন। বামাক্ষেপা যখন নাদস্বরে তারা-নামোচ্চারণ করিতেন, তখন সমগ্র মন্দির-প্রাঙ্গণ, অদূরস্থিত বনবিটপী-সমাচ্ছাদিত শিমুলতলা এবং নদীবক্ষ কাঁপাইয়া সেই স্বরলহরী শ্রোতৃগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিত এবং বামাক্ষেপার হৃদয় পুলকরসে আর্দ্রীভূত করিয়া যেন সে স্বর বাঞ্ছিতের চরণ সমীপে পৌঁছিয়া ভক্তের হৃদয় ব্যথা জ্ঞাপন করিয়া দিত।

মায়ের মন্দিরের নিকটেই শিমুলবন। এইস্থানে বহুশাখা-সমন্বিত একটী বিশাল শাল্মলী তরুতলে বশিষ্ঠদেবের সেই যোগাসন। নানাবিধ তরুরাজিতে এই যোগাসন পরিবেষ্টিত। রজত-কৌমুদী-বিভাষিত গভীর রজনীতে ক্ষেপা একাকী সেই স্থানে আপনহারা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। শালবৃক্ষের নির্য্যাস-গন্ধে আমোদিত, বিহগকুলের মধুর কূজনে মুখরিত, যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভূত হবির্গন্ধে সুগন্ধিত, তদুপরি ক্ষেপার সরল মধুর

তারানাম-নিনাদিত সেই সমগ্র অরণ্যানী এবং শিমুলতলার সেই মনোরম দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিক স্বতঃই হৃদয়ে শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। যোগীবর বামাচরণের সংমিশ্রণে এই স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মধুরিমা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখানে একবার আসিয়া পাগলের সহবাস সুখ প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমি যত বড়ই সংসারাসক্ত জীব হও না কেন, ক্ষণেকের তরেও তোমার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পরিপূরিত হইবে। পাঠক! ঐ যে সেই পবিত্র আসন; বামার পদস্পর্শে পবিত্র সেই সমাধি-মন্দির, আজ সাধক বিহনে অরণ্যময়। হায়! এ জগতে আর সে মধুর সম্মিলন ও বামাচরণের মুখের সেই শান্তিপ্রদ ভক্তি-গদ্‌গদ মধুর 'তারা' 'তারা' ধ্বনি আর কাহারও কর্ণকুহর পবিত্র করিবে না।

ক্ষেপা একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিমুলতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ভক্ত আসিয়া নিকটে বসিল এবং বলিল—বাবা! অনেক দিন ধরে আপনাকে দেখ্‌বো দেখ্‌বো ক'রে সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আজ একবারে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি। পায়ের ধূলা দেন, এখন বেশ ভাল আছেন ত'?

বামাচরণ। বসুন বাবা! অমনি একরকম আছি বাবা, তারা বেটী বড় বদ্, খুব কষ্ট দেয়; বেটীর পেসাদও সময় সময় বন্ধ ক'রে দেয়, আজ কিছু কারণ টারণ এনেছ কি?

ভক্ত। এনেছি বাবা, এই নিন্, কিছু ভাল সন্দেশও এনেছি—সেবা করুন, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" আপনি খেয়ে সন্তুষ্ট হ'লেই আমাদের সুখ।

বামাচরণ। বেশ ভাল বাবা! সবাই মিলে খাও বাবা, আমার কুকুরকে কিছু দাও, আমাকে কিছু দাও।

সদানন্দময় পুরুষ বামাচরণ সুধাপানে আনন্দোন্মত্ত হইয়া হাততালি দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—"ম'রবো আর অমনি যাব ব্রহ্মে মিশাইয়ে, তারার চরণে মিশাইয়ে।"

আজ কয়েক দিন হইল—ময়ূরভঞ্জের জনৈক উকীল বামার পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ মায়ের মন্দিরে ছিলেন। এই সময় পুনরায় আসিয়া ক্ষেপার নিকট বসিলেন। ক্ষেপার তখন পূর্ণানন্দ, উকীলবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন; অপর ভক্তটীর সহিত তাঁহার আলাপ হইল। উকীলবাবু বামার সেই ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—হাজার নেশাই করুন, আর কারণই খান, মুখে বাজে কথার নামমাত্র নাই; কেবল ঐ তারা তারা।

উকীলবাবু বলিলেন—বাবা! "সুরাপান করিনেরে সুধা খাই জয় কালী বলে?"

বামাচরণ। হাঁ বাবা! "মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা-মা।"

ভক্ত। হ্যাঁ বাবা! ব্রহ্মেও মিশ্‌বেন আবার তারার চরণেও মিশবেন দুই কি এক?

উকীলবাবু। বাবা! বোধোদয়ের সেই পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন উদ্ভিদ, আর ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।

বামাচরণ। ওসব বড় বদ্‌খৎ। তারা ব্রহ্মও বটে আবার

দয়াময়ী মাও বটে—দুইই। জ্ঞানীর কাছে যিনি নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকার। নিরাকারের সাধনা হয় না, বড় কঠিন "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং" অব্যক্ত ব্রহ্মে মন রাখিয়া সাধনা করা কঠিন ব্যাপার, তাই তারা তারা, মা মা ব'লে ডেকে বড়ই সুখ পাই। এই বলিয়া পাগল তারা নামে দিগন্ত কাঁপাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন —ব্রহ্ম ও শক্তি, ব্রহ্ম ও শক্তি একশোবার কি বল্‌ছিস্, অগ্নি আর দাহিকা-শক্তি অভেদ! অভেদ!

ভক্ত। এইজন্যই ত' রামপ্রসাদ সোজা কথায় গান বেঁধেছেন ঃ—

"এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাধায়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা,
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥"

বামাচরণ। হাঁ তিনি সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন ; সাকার নিরাকার দুইই।

অপর ভক্ত। আর সেই চেতন, অচেতন উদ্ভিদ—সেটা কি বাবা?

বামাচরণ। দূর শালারা! এক চৈতন্যে জগৎ চেতন। জড় পদার্থে যিনি, উদ্ভিদেও তিনি, মনুষ্যেও তিনি। সমস্তই সত্য, তবে

সেই চৈতন্যকে জানার ইতর বিশেষে সৃষ্টির ক্রম বিকাশ। মানুষই তাঁকে ভালরূপ জান্‌তে পারে। তাঁকে ভাল ক'রে অন্তরে এবং বাহিরে জানলেই মানুষ মহাপুরুষ—অবতার। জড়ে তিনি আছেন সত্য, তবে জড় তা জানে না; তাই সে চেতন নয়। তিনদিন মানুষ ভাত না খেলে মরার মত হয় কেন? বকাস্‌নে শালারা, এই বলিয়া গান ধরিলেন—"ব্রহ্মাণ্ডটা খুঁজে এলাম মা তোমারে, ব্রহ্মময়ী কোথাও দেখা পেলাম না মা, এখন দেখ্‌ছি হৃদয়ে তুই।"

উকীল। আচ্ছা বাবা! ব্রহ্ম ও শক্তি কি অভেদ?

বামাচরণ। শক্তিমান পুরুষ আর তার শক্তি কি আলাদা? আগুন আর তার দাহিকাশক্তি পৃথক্ কল্লে কি থাকে? "শক্তি-র্ব্রহ্ম শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্দেবো জনার্দ্দনঃ। ইন্দ্রাদ্যাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ।" সমস্তই শক্তি রে বাবা, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ক'রে জগতের সমস্তই শক্তিময়। যে এই অপরিসীম শক্তিতত্ত্ব সাগরে ডুবিয়াছে, সে যে আর মা ভিন্ন কিছুই জানে না। তার পক্ষে যে মাই সব, সে মাকেই চিনিয়াছে, মাকেই বুঝিয়াছে, মাময় দৃষ্টিতে সে আপন ভুলিয়া আত্মহারা হইয়াছে। শক্তি মানে—বল বিক্রম বুঝলে হবে না, শক্তি মানে—আত্মা। পরব্রহ্মের চিৎশক্তি আমার মা, বিষ্ণুর শক্তি বলিতে গেলে লক্ষ্মীকে না বুঝিয়া বিষ্ণুর আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মার শক্তিকে বুঝিতে হইলে, যেমন স্বয়ং ব্রহ্মাকে বুঝায়; শিবের শক্তিকে বুঝিতে হইলে যেমন স্বয়ং শিবকেই বুঝায়, সেইরূপ ব্রহ্মের

শক্তিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। শক্তিহীন কিছু কিছুই নহে, জড়পদার্থ শক্তিহীন শিব শব প্রায়। তা হ'লেই বুঝিতে হইবে মা ও বাবা এক। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লি, মাকে পেলেই বাবাকে পাওয়া যায়।

উকীল। তবে তাঁকে মা বলে ডাকা কেন? বাবা বলেও ত' ডাক্‌তে পারেন?

বামাচরণ। দূর বেকুব। তিনি স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, জড়ও নয়। তবে স্ত্রীবাচক শব্দ নাকি কল্পলতা সর্ব্বফলদাত্রী এইজন্য উপাসনার সময় স্ত্রী বা মাতৃমূর্ত্তিতেই তাঁকে ডাক্‌তে হয়।

উকীল। তবে মাতৃরূপে উপাসনাই ঠিক?

বামাচরণ। তবে বুঝ্‌লি কি? মা বাবা যে এক—এই বল্লুম। যতদিন জন্ম মরণ রহিত না হয়, ততদিন মা বাবাই জীবের সর্ব্বস্ব। আগে মা তারপর বাবা। মা বাবাকে চিনিয়ে না দিলে, সে শক্তি না পেলে ত' চিনিবার উপায় নাই। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ শক্তি অর্থাৎ আত্মাই হ'লেন আমার তারা-মা, ঐ আদ্যা-শক্তি কালী মা, তাহারই ত্রিগুণে তিনের সৃষ্টি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। শক্তি সর্ব্বত্রই নিরাকার। তারা বেটী ব্রহ্মের ইচ্ছা-শক্তি আত্মশক্তি অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে এই চরাচর জগতে ত্রিমূর্ত্তিতে সৃজন, পালন ও হরণ হইতেছে। মহাপ্রলয়ের মহাকালগর্ভে সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার মহাকাল আমার মায়েতেই লয় হয় বলিয়া আমার মার নাম কালী। সকলের আদি বলিয়া তাঁহাকে আদ্যাকালী বলে।

উকীল। আচ্ছা প্রভু! আমরা যে কালীমূর্ত্তি গড়ে পূজা করি, সে মূর্ত্তির গলায় অত মুণ্ডমালা কেন? তখন ত' মানুষের সৃষ্টি হয় নাই, তবে মুণ্ড কোথা থেকে এলো?

বামাচরণ। মুস্কিল কল্লি যেরে তোরা। অত কথা আমি বলে কেবল সময় নষ্ট কর্‌তে পারি নি। ওসব জেনে তোর কি হবে; ওতে আছেই বা কি! অত গভীর জলে ডুব দিলে যে হাঁপিয়ে মর্‌বি রে শালারা।

উকীল। প্রভু আপনার পায়ে পড়ি বলুন।

বামাচরণ। ওরে, আমি মুখ্যু, পড়া বিদ্যে আমার নেই, নিরেট মুখ্যু জানিস্ ত'? যখন রজোগুণ-শক্তিতে সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো, সত্ত্বগুণ-শক্তিতে পোষণ হ'তে লাগ্‌লো, কেবল সৃষ্টি আর পোষণে ত' হবে না—নাশ তো দরকার। তমোগুণে নাশ কিন্তু তমোগুণ ত' উত্তেজিত হয় না, যাহাকে সৃষ্টি কর্‌লুম তাহাকে নাশ কিরূপে সম্ভব। তাই মা আমার একশত আটবার আপনি আপনি নাশ হইয়া তমোগুণের শক্তি বর্দ্ধিত কর্‌লেন, অর্থাৎ তমোরূপী শক্তিহীন শিবকে শক্তিমন্ত কর্‌লেন। ঐ একশত আটবার নাশের একশত আটটী মুণ্ডমালা মার গলায় ঝুল্‌ছে।

উকীল। তখন নিরাকার শক্তি মূর্ত্তিমতী হয়েছিলেন?

বামাচরণ। মূর্ত্তিমতী না হ'লে কি মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়, আর বকাস্‌নে, বাজে বকা আমি অত ভালবাসিনে—কেবল পিত্তি বৃদ্ধি। ওসব জেনে কি হবে? মাকে পেতে হ'লে কান্নার দরকার, আমি বলি ওসব বাজে কথা।

রাত্রি প্রায় আটটা বাজে; এমন সময় জনৈক মোক্তার কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তথা হইতে ভাল ভাল সুখাদ্য দ্রব্য, যন্ত্রভরা কারণ ইত্যাদি লইয়া বামার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পাগলের সেই রুক্ষমভাব দেখিয়া বলিলেন—বাবা! প্রণাম, আজ যে বড় রেগেছেন দেখ্‌ছি।

বামাচরণ। কেও, মোক্তার বাবু! দেখ না বাবা, শালারা কেবল বকাচ্ছে, আমি বাবা মুখ্যু মানুষ, আমাকে অত বেদ-বেদান্তের কথা বল্‌তে বলে, কি অন্যায় বাবা! আমি বাজে খাটুনি খাটতে পারি না, যাতে রস নাই, প্রাণ ভরে না, সেই নীরস তত্ত্বে দরকার কি? তারা বল আর কাঁদ, সব পথ সোজা হ'য়ে যাবে। এই শিবোক্ত আগম পথের চেয়ে কি আর পথ আছে? আচ্ছা মোক্তার বাবা! এখন ধড়াচূড়া পরে কোত্থেকে আস্‌ছো।

মোক্তার। বাবা! আমি কল্‌কাতা গেছ্‌লাম। আপনার জন্যে অনেক ভাল জিনিষ এনেছি, এই নিন্।

বামাচরণ। কই দেখি দেখি, বলিয়া পাগল কাছে আসিয়া বসিল এবং সেই সকল উপাদেয় দ্রব্য ও দুই বোতল কারণ দেখিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। হাততালি দিয়া বলিল—বাবারা! আনন্দময়ীর আনন্দে মত্ত হও, মায়ের নাম ক'রে কাঁদতে থাক, সকল ভাবনা, সকল যাতনা ঘুচ্‌বে। আনন্দই ত' আমার মা! নিরানন্দ ব্যক্তির ধর্ম্ম নাই, মা তাকে দেখ্‌তে পারে না। মাকে পেতে হ'লে সদাই আনন্দে থাক্‌বে।

বামাচরণ মোক্তার-প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যগুলি লইয়া সকলকে

ভাগ করিয়া দিলেন, মন্ত্রটীর গলা ভাঙ্গিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন।

উকীল বাবু মোক্তার মহাশয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ দুই তিন দিন আমি এখানে আছি, কই একদিনও আপনার দেখা পাই নাই ত'?

মোক্তার। আজ্ঞে হাঁ; আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, এই আস্‌ছি, সেখানে একটী মক্কেলের বাড়ীতে গিয়াছিলাম তার ছেলে জাত্যন্তর হ'য়েছে; এখন বিষয় পাবে কি না এই সমস্যা?

উকীল। স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি চ্যুত হ'লে বিষয় পাবে না।

বামাচরণ। সে শালা কিছুই পাবে না! তার একূল ওকূল দুকূল গেল. তারা মা যাকে যে ধর্ম্ম, যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে পাঠিয়ে দেন, সে যদি তার তঞ্চক করে, তাহা-হ'লে কি তার ভদ্রস্থ আছে। সেই দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের কথা পড়িস্‌নি। সে দাঁড়কাকের কাছে যেতে পাল্লে না, আর ময়ূরগুলো ত' তাকে ঘৃণা ক'রে তাড়িয়ে দিলে। তখন তার "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" হ'লো! লোভের বশে কখন জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌বে না, তা' হলে তার আর রক্ষা নাই। সে চির-কাল পতিত হ'য়ে থাক্‌বে। আজ কাল সত্য কথা বলাই ধর্ম্ম। যে কথার ঠিক রাখ্‌তে না পারে, সত্য থেকে পা ফস্‌কে পড়ে যায়, সে আর উঠিতে পারে না।

মোক্তার। আচ্ছা বাবা! ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা মহাপাপ, কেমন নয়?

বামাচরণ। তার আর কথা আছে। এমন পাপ আর কিছু নাই। তার কোন জন্মে উদ্ধার হয় না, তাকে অনেক পেঁচিয়ে পড়তে হয়। ভগবান্ মানুষকে গড়বার সময় তাকে একটা ধর্ম্ম ও একটা জাতি ঠিক ক'রে গড়ে দেন। সে যদি খোদার উপর খোদকারী ক'রে সমস্ত নষ্ট করে, তবে তার ইহকালও নাই—পরকালও নাই।

মোক্তার। হাঁ, ভগবান্ ত' গীতায় বলেছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

বামাচরণ। তবে বাবা, ভগবানের কথা কি মিথ্যা হ'তে পারে। মানুষের হিতের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে লেগে থাকাই খুব ভাল। আর দেখ বাবা! জগতের যা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই মনকে নিয়ে। তোমার মন যদি ঠিক হ'লো; তবে আর কিছুতেই কাজ নেই। মন ঠিক ক'র্ত্তে চেষ্টা কর। জগতে যা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, মন্তোর-তন্তোর দেখ্ছো, সবই মনকে বশ করবার জন্যে, তা' পারলেই ত' "মার দিয়া কেল্লা" তা' হ'লেই জয়জয়কার। তাই বলি—আপনার ধর্ম্মে থেকে, শুদ্ধমনে ভগবান্কে ডাক, তা' হলে সব লেটা মিটে যাবে।

মোক্তার। আচ্ছা বাবা! যাদের ঐরূপ জাতিপাত হয়, যারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাদের ত' অদৃষ্টের ফল বলে বল্তে হবে?

বামাচরণ। বাবা, অদৃষ্টের ফল না হলে, কিছুই হবার যো নাই। পূর্ব্বজন্মের সুকর্ম্মের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়া যেটুকু ভাল

কর্ম্ম, সেইটুকু ভোগ ক'রে, তার পর পাপের ভোগ ভুগতে হয়; সবই কর্ম্মফল—নতুবা "সুখস্য দুঃখস্য ন কোপি দাতা, স্বকর্ম্মসূত্র-গ্রথিতো হি লোকঃ।" তার ঐ যে পতন—তাও বিধিবদ্ধ, মা ক'রে সে কোথায় যাবে, তাকে ক'র্ত্তেই হবে।

উকীল। আচ্ছা বাবা! সত্যই ত' ধর্ম্ম আপনি বল্‌ছেন।

বামাচরণ। আমি কেন বল্‌বো গো, আমি কে, শাস্‌তোর বলে। সত্যের চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই, পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রামচন্দ্র বনে গেছলেন, জান না। তখন ত্রেতাযুগ, তিনপাদ ধর্ম্ম ছিল; আর এখন কলিযুগ, ধর্ম্মের এক পা আছে, ঐ এক পাই সত্য ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। এই সত্য রক্ষার জন্য মন তৎপর হ'লে, সহজে মনের ময়লা দূর হ'য়ে যায়, মনের পবিত্রতা সাধন হ'লেই মায়ের দয়া তাহার উপর পড়ে।

মোক্তার। সত্যই ধর্ম্ম, সত্য চিরকাল থাকে, আর কিছুই চিরকাল থাকে না।

বামাচরণ। হাঁ বাবা, সত্যের বলে বলীয়ান হ'লে, তোমাকে কেউ হটাতে পারবে না, চিরকাল সুখে থাক্‌বে। একজন সত্যবাদী জমীদার ছিল জানিস্‌ বাবা! সে সত্যভঙ্গ কিছুতেই ক'র্ত্তো না, তাতে-তার প্রাণ যাক্‌ আর থাক্‌। জমীদারের কীর্ত্তি-কলাপ অনেক ছিল। সাধু-সেবা, পুকুর প্রতিষ্ঠা, হাট বসান, বাজার বসান এ সকল তার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার বসান হাটে যে সকল গরীব পশারীরা আস্‌তো, জমীদারের হুকুম ছিল, কোন জিনিষ অবিক্রীত হ'লে, তাহা সরকারে দিতে

নব্য দাম লইয়া যাইবে। এই জন্য সামান্য দিনের মধ্যে তার হাট বাজারে অনেক পশারী আস্‌তে লাগলো, উন্নতিও খুব হ'লো। অনেক ভাল ভাল জিনিষ পত্র বেচা-কেনা হ'তে লাগলো। এরূপে অনেক দিন যায়, একদিন একটা লক্ষ্মীছাড়া মাগী একটা অলক্ষ্মী গড়িয়া সেই হাটে বেচ্‌তে এনেছে। অলক্ষ্মীকে কে কিনিবে? সমস্ত দিন বসে বসে তার আর বিক্রী হ'লো না; শেষে সন্ধ্যাবেলা সে সরকারে গিয়া ঐ অলক্ষ্মী জমা দিয়া দাম চাহিল। নায়েব গোমস্তারা অলক্ষ্মীর নাম শুনিয়া বলিল—উহা আমরা লইব না, তুই নিয়ে যা। মাগী কিন্তু কিছুতেই শুনে না, কেবল বলিতে লাগিল—এই কি তোমাদের সত্যি কথা? এইরূপ গোলমাল হইতেছে, এমন সময় জমীদার মহাশয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নায়েব গোমস্তারা সমস্ত বলিল। সত্যপ্রিয় জমীদার বলিলেন—যখন বলা হইয়াছে,—অবিক্রীত সমস্ত দ্রব্য সরকারে জমা দিয়া দাম লইয়া যাইবে এবং যখন উহার ঐ দ্রব্য বিক্রয় হয় নাই, তখন অবশ্য উহা গ্রহণ করিতেই হইবে।

নায়েব গোমস্তারা জমীদার মহাশয়কে কত নিষেধ করিল—প্রভু! অলক্ষ্মী মূল্য দিয়া কখন গৃহে রাখিবেন না, তাহা হইলে আপনার অমঙ্গল হইবে। জমীদার বলিলেন—কি করিব, যখন সত্য প্রচার করিয়াছি তখন তাহার অপলাপ করা ত' যাইতে পারে না, তাহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হইবে। তোমরা উহাকে উচিত মূল্য দিয়া অলক্ষ্মী গ্রহণ কর। জমীদার মহাশয় এই

হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারিবর্গ অগত্যা মাগীর নিকট হইতে অলক্ষ্মী লইয়া উচিৎ মূল্য প্রদান করিল। মাগী জমীদারের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

সেই অলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশের পর হইতেই জমীদারের অবনতির সূত্রপাত হইল। নানাস্থানে বিশৃঙ্খল-ভাব দেখা দিল। ধার্ম্মিক জমীদার কিন্তু অচল অটল। সত্য বজায় রাখিয়াছি বলিয়া তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহাতে যত কষ্ট হয় হউক, ধর্ম্ম ত' থাকিবে? একদিন ধার্ম্মিক জমীদার পূজায় বসিয়া ইষ্ট-সাধনায় রত আছেন। এমন সময় গৃহলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং জমীদারকে বলিলেন—বাবা! তুমি অলক্ষ্মী ঘরে আনিয়াছ, অতএব আমি থাকিতে পারিব না—আমি চলিলাম।

জমীদার বলিলেন—মা! আমি ত' ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছি, তারপর আপনার ইচ্ছা। লক্ষ্মী কিছুতেই শুনিলেন না, চলিয়া গেলেন। জমীদার তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তারপর তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসিয়া ঐরূপ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপর গৃহ-দেবতা বিদায় লইলেন। জমীদারের যা কিছু ছিল, একে একে সমস্তই যাইতে লাগিল। জমীদার এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও অচল অটল—সুমেরুবৎ স্থির গম্ভীর। কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন জমীদার কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পড়িলেন এবং বলিলেন —একি প্রভু! আপনাকে আমি ছাড়িয়া দিব কেন? আপনাকে

বজায় রাখিবার জন্যই ত' আমি অলক্ষ্মী গৃহে আনিয়াছি—পাছে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়; পাছে আমি মিথ্যাবাদী হই, সেই জন্যই ত' এ কার্য্য করিয়াছি। অতএব আমি সকলকে ছাড়িতে পারি কিন্তু আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। ধর্ম্ম দেখিলেন—বাস্তবিকই ত' তাই। জমীদার ত' ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার ভয়েই অলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়াছেন। তখন ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—বৎস! তোমার জয়জয়কার হউক; তুমি যথার্থ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, তুমিই যথার্থ ধার্ম্মিক। আজ হ'তে আমি তোমাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলাম। জমীদার উঠিয়া ধর্ম্মের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। জমীদারের ধর্ম্ম বজায় রহিল, পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্ম আরও দৃঢ়ভাবে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। মানুষ ধর্ম্মহীন হইলে তাহার যাবতীয় দুর্ভাগ্য আসিয়া জুটে। তাহার অকালে পুত্র-কন্যার নিধন হয়। তাহার গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। যাবতীয় পাপকার্য্য তাহার সংসারে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তির তাহা কিছুই হয় না, ধর্ম্মবলে সে সকল কার্য্যে জয় লাভ করিতে পারে। তাহার অমঙ্গলের কোন কারণ থাকে না। ধর্ম্ম, জমীদার মহাশয়কে যখন ছাড়িতে পারিলেন না; তখন যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার বাধ্য হইয়া সেই জমীদার গৃহে পুনরায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্ম যেখানে সেই-খানেই সৌভাগ্য, সেইখানেই লক্ষ্মী, সেইখানেই দেবতা। ধর্ম্মছাড়া ইঁহারা কখনই থাকিতে পারেন না। কাজেই পুনরায়

তাহাদিগকে আসিতে হইল। জমীদারেরও জয়জয়কার হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার আরও উন্নতি হইল, এবং যশোভাতি চারিদিক আলোকিত করিল। তাই বলি—বাবারা! ধর্ম্মকে ধরে থাক্—সত্যনিষ্ঠ হ’ কিছুরই ভাবনা হবে না। ধর্ম্ম বড় চিজ্ রে বাবা, এমন আর কিছুই নাই। ধর্ম্মহীন হ’লে মানুষের আর কিছুই থাকে না—এ কথা ত’ কতবার তোদের বলেছি। কেবল কেঁদে কেঁদে মাকে ডাক্‌তে শেখ্। নিজের ধর্ম্ম বজায় রেখে মনে প্রাণে কেবল ডাক আর কাঁদ, এমন সহজ পন্থা আর কিছুই নাইরে বাবা!

মোক্তার। বাবা! কান্না আসে কই?

বামাচরণ। অমনি কি আস্‌বে, পূর্ব্বজন্মের সাধনা চাই। তবে সে সাধনা আছে কি না তা দেখ্। সাধু-সঙ্গ কর্, নির্জ্জনে জপ কর্; এ জন্মে যদি কিছু না হ’লো, না হয় কিছুতো এগিয়েও রইল, পরজন্মে কেলেবেটী তার পর থেকে ঘুঁটী চাল্‌বে। আমি কিন্তু বাবা! "মায়ের নাম ব্রহ্ম জেনে, ভাল মন্দ সব ছেড়েছি" এ জগৎ যে মায়ের মূর্ত্তি, মা ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই না।

অপর ভক্ত। আচ্ছা বাবা! আপনি অত মদ খান কেন?

বামাচরণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—মদ কিরে শালা, একি মদ—এ যে মায়ের চরণামৃত, আমি কি মাতাল রে শালা, যে মদ খাই। এই সুধা খেয়েই ত’ আমার দেহ নীরোগ—কখনও ব্যারাম্‌মের ধার ধারি না বাবা! যারা মজের জন্য মদ খায়—

মাতাল হয়, তাদের ইহ-পরকাল নেই। শুক্রের শাপে তাদের নরকে পচ্‌তে হবে। আর যারা সদানন্দে থাক্‌বার জন্য সদানন্দময়ীর চরণ-সুধা পান করে, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগায়—তারা কি মাতাল? যা শালারা—রাত হ'য়েছে, আর বৃথা সময় নষ্ট করাস্‌নে। কুণ্ডলিনী শক্তি জেগেছে, এইবার মার কাছে যাই—এই বলিয়াই "জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, দিন গেল গো মা" বলিয়া গাহিতে গাহিতে বামা সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

ভক্তগণ সেই আনন্দময় মূর্ত্তি, সেই গভীর ভাবপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল—ইহা কি এক জন্মের সুকৃতির ফল, বহু জন্মের তপস্যা, নতুবা এরূপ অটল বিশ্বাস আস্‌তে পারে কি? রাত্রি অনেক হ'য়েছে দেখিয়া ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শাক্তভক্ত বামাচরণ মায়ের আদুরে ছেলে, পাগ্‌লা বামা মাতাল নেশাখোরকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। সাধারণ লোকে মদকে নেশার দ্রব্য বলিয়াই জানে এবং তাহাতে যে সব পাশবিক বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহারা তাহার বশেই কার্য্য করিয়া পতিত হইয়া থাকে। বামাচরণকে কেহ মদ খাওয়াইলে তাহার পাশবিক-বৃত্তির উত্তেজনা হইত না; এমন কি তিনি স্বস্থান হইতে উঠিয়া কোথাও যাইতেন না। তিনি জীবনে মদ্য কখনও নিজে ক্রয় করেন নাই। তাঁহার ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না, যে যাহা দিত তিনি তাহাই খাইতেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রে বিশেষত্ব বলিয়া পরিলক্ষিত হইত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সীতার কথা।

বামাচরণ কোন ঋতুতেই মুহ্যমান হইতেন না। ষড়্ঋতুর প্রকোপে সাধারণ মানবের মত কাতর বা হর্ষোৎফুল্ল হওয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ছিল না। তিনি সদাই সমভাব, বামাচরণের চরিত্রে কখনও ভাবের আধিক্য বা অভাব পরিলক্ষিত হইত না। তিনি আনন্দময় পুরুষ, আনন্দই তাঁহার জীবনের একমাত্র উপভোগ্য বস্তু; আনন্দেই তিনি আত্মহারা হইয়া মানব-জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

একদিন বর্ষাকালের ঘোর দুর্দ্দিনে বামাচরণ একাকী আপন কুটীরে অবস্থান করিতেছেন। আজ কয়েক দিন ধরিয়া দারুণ বর্ষা নামিয়াছে, সমস্ত দিনরাত আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, অনবরতই বৃষ্টি পড়িতেছে। চণ্ডীপুরে তারামায়ের মন্দিরে এবং বামার নিকট লোকজনের তত সমাগম নাই। দুই একজন যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারাও অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া দেবী-দর্শন করিয়া আপন আলয়ে প্রস্থান করিতেছেন। সমস্ত দিন এইরূপে কাটিল—টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির আর বিরাম নাই। সন্ধ্যার প্রাকালে আকাশ গভীরভাবে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া [illegible]সিল।

মেঘের আড়ম্বর, বজ্র-পতনের কড় কড় শব্দ, ক্ষণপ্রভার বিকট হাস্য দেখিয়া সকলে মনে করিল—সত্বরই মুষলধারে বারিপাত হইয়া ধরা প্লাবিত করিবে। কাজেও তাহাই হইল, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টির প্রকোপ বাড়িয়া উঠিল। তারাপীঠে মায়ের আরতির সময় অদ্য আর তত লোকসমাগম হইল না। এই ভীষণ শ্মশানে সন্ধ্যাকালে সহজেই লোকে আসিতে ভয় পায়। স্থানটী স্বতঃই ভীষণ ভাব-পূর্ণ, তাহার উপর আষাঢ়ীয় কৃষ্ণপক্ষের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; এ সময় এই স্থানের ভাব, তারাপীঠের এই শ্মশানের দৃশ্য, পাঠক! একবার মানস-নেত্রে অবলোকন করিয়া বুঝিয়া লউন—কিরূপ ভয়সঙ্কুল, কিরূপ চিত্ত-চমকপ্রদ, কিরূপ জনমানব-পরিশূন্য। এ কয়দিন বামাচরণ উপর্য্যুপরি বৃষ্টিতে অনবরত ভিজিয়াছেন। সেই বিশাল নগ্ন-দেহে অজস্র বারিপাত হইয়া দেহ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আজও সমস্ত দিন তাহার প্রিয় কুকুরটীর সহিত তিনি শ্মশানের চারিদিক—আসন, পঞ্চবটী, মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণ, জীবিতকুণ্ডের সোপান, তৎপরে দ্বারকা নদীর সমস্ত তট-ভূমি আপন মনে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেন। সন্ধ্যার পর যখন মুষল-ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পাগল তখন আপন মনে নিজের সেই ক্ষুদ্র ঘরটীর মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। ঘরে আসবাবের মধ্যে—অস্থি-পঞ্জরের ছড়াছড়ি, নরকঙ্কাল চারিদিকে বিস্তৃত। ক্ষেপা শ্মশান হইতে অজস্র নরমুণ্ড কুড়াইয়া রাখিয়াছেন, দেওয়ালে একখানি খড়গ ঝুলিতেছে, তাহা সময়ে সময়ে মায়ের

নিকট বলির জন্য ব্যবহৃত হয়। বামাচরণ একাকী সেই গৃহ-মধ্যে অন্ধকারের কোলে আপন অঙ্গ মিশাইয়া কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন বা বকিতেছেন, আর প্রাণ ভরিয়া নেত্রজলে অভিষিক্ত হইয়া "তারা" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার বাহন কুকুরটী প্রভুর ভাব দেখিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া গৃহের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কখন বামাকে আঁচড়াইতেছে, কখনও কামড়াইতেছে, তাহাতে সময়ে সময়ে রক্তপাত পর্য্যন্ত হইতেছে, তথাপি বামার ভ্রূক্ষেপ নাই। এক একবার কেবল বলিতেছেন—কালু, অত জোরে কামড়োনা, রক্ত প'ড়্বে। কুকুরটীও যেন বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর পদতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

এখনও বেলা আছে, কিন্তু আকাশ এরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, তখনও রাত্রি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে মেঘে চারিদিক অন্ধকারময়, কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার কুটীরটীর মধ্যে ঘন-অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছে। বামাচরণ সেই কুটীর-মধ্যে অন্ধকারে কুকুরটীর সহিত অবস্থিত। বহুক্ষণ পরে এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। আজ প্রাতঃকাল হইতেই বামাচরণের গানের প্রতি বড়ই ঝোঁক হইয়াছে। আপনার মনে নানাপ্রকার গান গাহিতেছেন। গানের সমস্ত জানেন না, কাহারও এক কলি, কাহারও বা দুই কলি গাহিতেছেন—আর নিজেই নাচিতেছেন, হাসিতেছেন, এক একবার বলিতেছেন—কালু শুনলি? কালু "কাঁউ" "মাঁউ" করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে।

শ্যামাচরণ একান্তমনে প্রাণের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতেছেন—

"জান নারে মন পরম কারণ
শ্যামা মা কখন মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরি বরণ, করিয়ে ধারণ,
(মা আমার) কখন কখন পুরুষ হয়॥"

এই গানেই ত' বুঝা যায়—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, আজ কাল-রূপে পৃথিবী ডুবে গেছে, সবই কাল—সবই শক্তি। মাঝে মাঝে মায়ের হাসিতে আলো হ'চ্ছে, তারা-বেটী হাস্‌ছে তাইত' বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, বেটী ভিজে ভিজে দেখো আজ জলময়ী হ'য়েছেন। তারা-বেটী জলরূপী, স্থলরূপী, আবার বহুরূপী। তারা-বেটী ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না; যা দেখি তাতেই মা,—তারা-মা আমার নেই কোথা, দেখ্‌তে না জান্‌লেই ফাঁকা ঠ্যাকে; চিন্‌তে পারে না ব'লেই হাত্‌ড়ে মরে, এই বলিয়া গান ধরিলেন—

"শ্যামা কে পারে তোমায় চিন্তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা ত্রৈলোক্য জিন্‌তে॥"

বেটী পাষাণী! তুমি যাকে না চিন্‌তে দাও, যাকে ধরা না দাও, সে ধর্‌তে পারে না। তবে যার সাধন-বল আছে, তার কাছে তুমি জুজু, ধরা দেওয়া ছেড়ে বাঁধা হ'য়ে পড়ো। ক্ষেপা আপন মনে অন্ধকারে তারামায়ের কোলে বসিয়া কতই বকিতেছেন। এমন সময়ে একজন ভক্ত আসিয়া সেই গৃহে

প্রবেশ করিল। বামাচরণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—এ শালা আবার কোত্থেকে এলো, এই দারুণ দুর্য্যোগে এর খেয়াল ত' বড় মন্দ নয়!

ভক্ত। বাবা, আমাদের আর খেয়াল কোথা; তবে এইদিকে এসে প'ড়েছিলুম, দারুণ দুর্য্যোগে যাবার উপায় নাই, তাই একবার চরণ দর্শন ক'র্‌তে এলুম; প্রণাম হই বাবা!

বামাচরণ। এস বাবা, ব'স বাবা! কারণ টারণ কিছু এনেছ কি বাবা?

ভক্ত। হ্যাঁ বাবা, এই নিন্।

বামাচরণ সমস্ত দিন জলে ভিজিয়াছেন, এখন যন্ত্রটী দেখিয়া আনন্দ সহকারে তাহা ভক্তের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন এবং "জয় তারা" বলিয়া তাহা পান করিলেন। যে ভক্তটী আসিয়াছিলেন, তিনি আজ অনন্যোপায়—বাটী বহুদূর, কাজেই যাওয়া অসম্ভব। তাই বামার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভক্তটী বেশ গাহিতে পারিতেন। আনন্দময় পুরুষ বামাক্ষেপা আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিলেন—বাবা বেশ হ'য়েছে, তুমি এসেছ, কেবল মায়ের নাম কর; আর আমি নাচি। খোলা প্রাণের খোলা কথা, সে কথায় কোন জটিলতা নাই। সেই বালকস্বভাব ক্ষেপার অবস্থা দেখিয়া ভক্তটী মুগ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—বাবা! আগে বল, এই দুর্য্যোগ কবে থাম্‌বে।

বামাচরণ বলিলেন—ওরে তার জন্য আর ভাবনা কি তারা-মা সব ঠিক ক'রে দেবেন। কাল সকালেই সূর্য্য উঠ্‌বে। ভক্ত

জানিতেন—বামার কথা অকাট্য। তিনি মনের আনন্দে গান আরম্ভ করিলেন—

"যে হয় পাষাণের মেয়ে,
তার হৃদে কি দয়া থাকে,
দয়াহীনা না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে।"

বামাচরণ। ওরে ও গান ত' অনেকবার শুনেছি, বেশ চমৎকার গান। আজ অন্য রকম আর একটী গা।

বামাচরণ তারা-নামেই পাগল, ভক্ত বামাচরণের মনোভাব কতক বুঝিতে পারিয়া গান গাহিলেন—

"ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন রূপ কালো হ'লো॥
কাল মেয়ে ত' অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখ্‌লে পরে হৃদিপদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী, কাল হ'তে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে, সেই মজেছে, অন্য রূপ লাগে না ভাল॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিলো।
না দেখে নাম শুনে কাণে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো॥"

বামাচরণ গান শুনিয়া বিভোর হইয়াছেন। ডাকিলে আর সাড়া পাওয়া যায় না। মুদিত-নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে। ভক্তটীও বামার ভাব দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। মায়ের নাম শুনিলেই যাহার নেত্র হইতে অনবরত প্রেমধারা

পতিত হয়—সে কি সহজ ভক্ত! মহাপুণ্য সঞ্চিত না থাকিলে এরূপ সৌভাগ্য-সংযোগ কাহারও হয় না। এখনও অবিরাম বৃষ্টি পতিত হইতেছে, কুটীরের মধ্যে স্থানে স্থানে সে ধারা প্রবেশ করিতেছে কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। ভক্তটী তারাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তদীয় প্রিয়পুত্র বামাচরণের পদধূলি লইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"মা!" এই সাধু পুরুষের মত অকপট ভক্তি দাও, আমি তোমার নাম করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধন্য হই। এমন দিন কি হবে না মা!" এই বলিয়া অশ্রু-বিগলিত নেত্রে আবার গাহিলেন—

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে দুনয়নে প'ড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
(তখন) ধরাতলে প'ড়বো লুটে,
(আমি) তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে।
আঁখি অন্ধ দেখ্‌ না চেয়ে, (মা যে) তিমিরে তিমিরহরা॥"

বামাচরণ এইবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন—বাবা! বেঁচে থাক, আজ যে কিরূপ আনন্দ পেলেম—তা ব'লতে পারি না।

ভক্ত। বাবা তুমি তো সদানন্দময় পুরুষ। তোমার আবার নিরানন্দ কোথায়! যে আনন্দময়ীকে বাঁধতে পেরেছে, তার সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সদাই আনন্দ, আপনাকে আবার আমি আনন্দ দিব কি? বরং আজ এই দুর্য্যোগে আপনার আশ্রয়ে এসে আমার জীবন ধন্য হ'লো।

বামাচরণ। না বাবা! কিছু না, সকলই মায়ের ইচ্ছা। দেখ বাবা, তারাবেটী বড় পাষাণী। এই বলিয়া নিজেই গাহিলেন—

"ঈষাণী পাষাণী কি মা হ'য়েছ অধীনের বেলা।
তারিতে তনয়ে কাতর, পা তোর দিতে হলি পাথর,
পিতার ধর্ম্ম রাখলি মা তোর, তাই আমায় করিলি হেলা।"

গাহিয়া বলিলেন—তারা-মা! তোর দয়ার অন্ত নাই কিন্তু তোর দয়া পেতে হ'লে, কেবল আমার আমার করলে চল্‌বে না; ত্যাগ করাটা ভাল করে শিখ্‌তে হবে।

ভক্ত। প্রভু! ত্যাগেই সুখ, তাই গীতায় ভগবান্‌ ব'লেছেন,—কর্ম্ম কর কিন্তু ফলের আশা ক'রো না।

বামা। বাবা! হিন্দুশাস্ত্রে "গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ" এই দুইখানিই পরম গ্রন্থ। কিন্তু ইহা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারে, এমন লোক নেই ব'ল্‌লেই হয়। কারণ গীতা ঠিক বুঝ্‌তে পারলে—তার আর কোন বিষয়ে আসক্তি থাক্‌বে না। সে আড়ম্বর-শূন্য হবে, অহঙ্কার তার থাক্‌বে না। খাঁটীর মানুষ হ'য়ে যাবে। একজন ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছেলেপিলেদের ইংরাজী লেখাপড়া শিখতে দিতেন না। বড়

ছেলেটাকে কাশীর টোলে দিয়েছিলেন। সেখানে ছেলে খুব পণ্ডিত হ'তে লাগ্‌লো। একদিন রাজা, পণ্ডিত মহাশয়কে ব'ল্‌লেন—আপনি ত' বৃদ্ধ হ'য়েছেন—আপনার অবর্ত্তমানে—সভা কে চালাবে। পণ্ডিত ব'ল্‌লেন—কেন মহারাজ! আমার ছেলেও বেশ পণ্ডিত হ'য়েছে। সে কাশীতে পড়্‌ছে; এবার বাটী আসিলে আপনার কাছে একদিন নিয়ে আস্‌ব। বহুদিন পরে পণ্ডিতের ছেলে বাটীতে এলো। ব্রাহ্মণ দুই তিন দিন পরে—তাহাকে রাজার কাছে নিয়ে এলো। রাজা সংসারী হইলেও বড় ধার্ম্মিক। ঠিক জনক রাজার মত মুক্ত পুরুষ—রাজর্ষি। রাজা ব্রাহ্মণের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাপু! তোমার কি কি শিক্ষা হ'য়েছে? যোগ-শাস্ত্র কিছু পড়েছো কি? ব্রাহ্মণের যাহা একান্ত আবশ্যক, যাহা শিক্ষা করিলে ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে, সেরূপ কিছু শিক্ষা হ'য়েছে কি? ব্রাহ্মণ যুবক খুব বুদ্ধিমান ছাত্র, চতুষ্পাঠীতে সকলেই তাহার সুখ্যাতি কর্‌তো, অধ্যাপক মহাশয়ও তাহার মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মণ যুবক এইজন্য মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি জানিতেন—তাহার মত ছাত্র খুব কমই আছে, এইজন্য সে সকলের কাছেই আত্মগরিমা প্রকাশ করিত। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণের অত্যাবশ্যকীয় কোন যোগ-শাস্ত্র পাঠ ক'রেছো কি? সে তখন গর্ব্বিত বচনে বলিল—যোগ-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ "গীতা" আমার কণ্ঠস্থ, গীতায় আমার সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না।

রাজা তাহার নিজমুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার শিক্ষা কিছুই হয় নাই; এখনও অনেক বাকী। তুমি ভাল করিয়া কেবল গীতাখানি আয়ত্ত করিয়া আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে রক্ষা করিব। কারণ তোমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে অবসর দেওয়াই ভাল।" রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ যুবক রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই পুনরায় গীতা পাঠের জন্য গুরুসমীপে চলিয়া গেল।

এবার কাশীতে গিয়া মনে প্রাণে ঐক্য করতঃ শ্রীভগবৎ-মুখ-বিনিঃসৃত শ্রীগীতা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। শ্রীগীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যতই তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল, যতই সে বিশেষরূপে ইহা আয়ত্তাধীন করিতে লাগিল, ততই তাহার মন হইতে বাহ্যভাব বিদূরিত হইতে লাগিল। সে যেন প্রেমময়ের প্রেম-হ্রদে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। সেই দাম্ভিক যুবক ক্রমশঃ এত নম্র হইয়া গেল যে, কেহ তাহাকে প্রহার করিলেও সে তাহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিত না। যখন সে তন্ময় হইয়া শ্রীগীতার মধুর যোগতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিত, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, কেহ ডাকিলে সাড়া পাইত না। সেই সময় হইতে সে আর কাহারও সহিত তত বাক্যালাপ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিত না। চারিটী আহার না করিলে নয়—তাই যথাসময়ে চারিটী আহার করিত। ভোগ বিলাসিতা তাহার

একেবারেই তিরোহিত হইল; বাক্‌পটুতা, অহঙ্কার, পাণ্ডিত্য তাহার কোথায় চলিয়া গেল। সে একেবারে যেন মাটীর মানুষ হ'য়ে গেল। গুরু ছাত্রের অকস্মাৎ এই ভাবান্তর এবং গীতায় তাহার প্রগাঢ় আসক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যখনই তিনি ছাত্রকে দেখিতে যাইতেন, তখনই দেখিতেন—যুবক ধ্যানোপবিষ্ট। ভগবন্নামাশ্রুকীর্ত্তনে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে। সে অনন্যশরণ হইয়া কেবল ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার বাহ্য জ্ঞান নাই। পূর্ব্বে এই পাঠ্যাবস্থাতেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য সে কত চেষ্টা করিত, বৎসরে দুই তিনবার বাটী আসিয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রের তত্ত্বাবধারণ করিত কিন্তু এবার প্রায় তিন চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, বাটী যাইবার নামও করে না, উপার্জ্জনের আসক্তি নাই; কেবল তন্ময় ভাবে নির্জ্জনে গীতাতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যুবক আত্মহারা হইয়া থাকে, সকল বিষয়েই তিনি এখন উদাস-ভাবাপন্ন; তাহার শরীরে যোগ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে; মনের মলিনতা বিদূরিত হইয়াছে। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা আর তাঁহার নাই; পরের অধীনতা সে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে—যাঁহার রসাস্বাদন করিলে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইবে—পার্থিব কটু কষায় ফলের জন্য আর লোভ করিতে হইবে না, যুবক এখন সেই ফলের অধিকারী হইতে অগ্রগামী হইয়াছে। তুচ্ছ বিষয় রূপ পার্থিব মাকাল ফলে আর সে মজিতে চায় না; স্ত্রী পুত্র পরিজনের প্রতিও তাহার

তাহার তত আসক্তি নাই; সকলের রক্ষাকর্ত্তা যখন শ্রীভগবান্; তিনিই যখন জীবগণকে, এই জগৎ সংসারকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে সমস্ত নাশ প্রাপ্ত হয়, যখন তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা—তিনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই; যখন সেই বিরাট পুরুষের প্রতি লোমকূপে সহস্র ব্রহ্মাণ্ড আবদ্ধ, তখন তুমি আমি কোন্ কীটানুকীট, যুবকের এইবার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পিতা-মাতাকে বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে—যাহা না করিবেন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের জীব একত্র হইলেও তাহা যখন করিতে পারিবে না; তখন আমার আমিত্ব কোথায়? আমি আমার কার্য্য করি, ফলের ভার তাঁহার উপর। তিনি যাহা করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার ত' অন্যথা হইবে না। এ সবই ত' তাঁহার, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার, এ ত্রিজগতও তাঁহার, তিনি কর্ত্তা, আমি কোন্ কীটানুকীট যে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিতে চেষ্টা করিব?

যুবক কর্ম্ম করেন—ভগবান্ তাহাতে যে ফল দেন, তাহাই বাটীতে পাঠাইয়া দেন কিন্তু তাহার জন্য যে একটা আসক্তি, একটা টানাটানি ভাব, তাহার জন্য যে একটা দুঃখ কষ্ট অনুভব তাহা আর যুবকের রহিল না। যুবক "গীতা" "গীতা" করিয়াই ত্যাগী হইয়াছেন। যেন সকল বিষয়েই অনাসক্ত পাগলের ভাব।

বাল্মীকি যেমন "মরা মরা" করিয়া রাম নামে উদ্ধার হইয়াছিলেন যুবকেরও শ্রীগীতা পাঠে, গীতা নাম জপমাল্য করিয়া তাহাই হইল। যাহা যথার্থ সুখের নিদান, ত্যাগ ভিন্ন তাহা

পাওয়া যায় না; বিনা ত্যাগে সুখ অসম্ভব; তাই যুবক এখন যথার্থ ত্যাগী পুরুষ, প্রকৃত যোগী হইয়াছেন। কেহ কিছু দিয়া যাইলে তিনি ভগবানের প্রদত্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং যথায় অভাব দেখিতেন, ভগবানের আদেশ বলিয়া তথায় তাহা প্রদান করিয়া সুখী হইতেন। আজ কাল যুবকের যে ভাব উপস্থিত, যে ভাবের ঘোরে যুবক বিঘোর—ইহাই যথার্থ ব্রাহ্মণের ভাব, তাহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বহুদিবস যুবক গৃহে গমন করেন নাই। সময়ে যাহা পান, তাহাই দেশে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বাটী আসিবেন কিনা, তাহার কোন সংবাদ দেন নাই। গৃহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। রাজা সময়ে সময়ে যুবকের তত্ত্ব লইয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণ পুত্রের বিষয় কিছুই বলিতে পারেন না। পিতা একদিন পুত্রকে লইয়া আসিবার জন্য কাশী গমন করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন—ধর্ম্মে তন্ময়তা আসিলে, যাহা হয়, পুত্রের তাহাই হইয়াছে। ধার্ম্মিক পিতা পুত্রের ধর্ম্মভাব দেখিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। তাঁহাকে বাটী লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণের সংসারে সুখের ভাতি বিভাসিত হইল। যুবক বাটীতে আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা তাহাকে দেখিতে চাহিলেন, যুবক কিন্তু এবার আর রাজ সভায় পদার্পণ করিলেন না। তিনি পিতাকে বলিলেন—বাবা! আপনি রাজাকে বলিবেন—আমার সময় নাই।

রাজা ব্রাহ্মণের মুখে তদীয় পুত্রের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া একদিন স্বয়ং তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং একবার

যে তাঁহার যথার্থ গীতা পাঠ করা হইয়াছে, তাহা জানিয়া যুবককে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দান করতঃ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। দেখ বাবা! এত দিনে সেই ব্রাহ্মণের ছেলের যথার্থ গীতার মর্ম্ম উপলব্ধি হইয়াছে। নতুবা "গীতা" "গীতা" করিয়া শুধু চীৎকার করিলে বা তাহার দুই একটা ফাঁকা শ্লোক আওড়াইলে বা একটু আধটু ব্যাখা করিলেই কি গীতার্থী হওয়া যায়? যে যথার্থ গীতা বুঝিয়াছে, তাহার বাহ্যিক বিষয়ের সকল আসক্তি নাশ হইয়াছে, এইরূপ ভাব যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল, সেই ব্যক্তিই যথার্থ গীতার্থী। বাপুরে ভগবানে যে মজিতে পারিয়াছে, যে মাকে চিনিতে পারিয়াছে, সে কি জগতের ধূলা-খেলায় মজিতে চায় বাবা। দেখ এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ চৌকিদার বড়ই রাম ভক্ত ছিল। সে প্রত্যহ তুলসী দাসী রামায়ণ এরূপ তন্ময় ভাবে পাঠ ক'র্‌তো যে শুনিলে কত পাষণ্ডের চৈতন্য হ'য়ে যেতো। সে দুপুর-বেলা কাজে যেতো কিন্তু একজন নূতন সাহেব এসে, তাহার সময় বদল ক'রে দিলে; তাহাকে বেলা নয়টার মধ্যে কাজে যেতে হবে—এই হুকুম বাহাল হ'লো। চৌকিদার প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া ব্রাহ্মণের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করে, তারপর রামায়ণ পাঠ করে, কিন্তু রামায়ণ পাঠে তাহার তন্ময়তা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এক দিনও সে মনিবের হুকুম মত ঠিক সময়ে কাজে হাজির হ'তে পারতো না। এই জন্য প্রত্যহ গিয়া সে প্রভুর নিকট মাপ চাহিত কিন্তু প্রভু বলিতেন—"কেয়া তুম্ পাগলা হোগিয়া, তুম্ ত' ঠিক টাইমমে হাজির হোতা হায়, আউর

এসা কসুরকা বাত কাহে বোল্‌তা ?” চৌকিদার মনে করিত—তাহার কাজে এত অবহেলা দেখিয়া প্রভু বুঝি তামাস করিতেছেন। তাহার চাকরি বুঝি আর বেশীদিন থাকিবে না এইরূপ চিন্তা করিয়া সে একদিনও ঠিক সময়ে কাজে আসিতে পারিল না। কিন্তু তাহার হাজির অভাবে প্রভুর নিকট কার্য্যের কোন ত্রুটী হইত না। কে একজন পুরুষ ঠিক তাহারই অনুরূপ আসিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে কাজ করিয়া যাইত। এইজন্য প্রভু সেই চৌকিদারকে প্রত্যহ ঠিক সময়েই দেখিতে পাইতেন। অথচ প্রত্যহই চৌকিদার আসিয়া তাহার কার্য্যে অবহেলার জন্য মাপ চাহিত।

একদিন চৌকিদার এত তন্ময় হইয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছে যে সেদিন উঠিতে তাহার বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সেদিন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনাহারেই কার্য্যস্থানে গমন করিল। তাহার মনের ধারণা আজ আর তাহার চাকরি থাকিবে না। তাড়াতাড়ি আসিয়া মনিবের নিকট উপস্থিত হইল এবং করযোড়ে বলিল—হুজুর আমার আজ বড়ই কসুর হইয়াছে, এমন আর হইবে না, আজকের মত মাপ করুন।

সাহেব তখন কি কাজ করিতেছিলেন। চৌকিদার তথায় উপস্থিত হইয়া ঐরূপ বলিলে তিনি ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন—“কই হ্যায় রে, এ পাগলাকো নিকাল দেও।” তাদের যিনি প্রধান, তিনি আসিয়া বলিলেন—তুমি প্রত্যহ এরূপ কেন কর,

আমরা ত' তোমাকে ঠিক সময়েই দেখিতে পাই, আজ ত' ঠিক সময়েই আসিয়াছ, তবে এরূপ বল্‌ছো কেন ?

তাহার কথা শুনিয়া চৌকিদার এইবার ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ তাহার সংজ্ঞা হইল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হইলে সে প্রভুর নিকট বিনয়-নম্র-বচনে বলিল—"হুজুর! হামরা নকরী ছোড়ায় দেও, হাম আউর কিসিকে নকরী নেহি করেঙ্গে, যো হামরা ওয়াস্তে এত্তা রোজ ঠিকা দিয়া, আবি উস্‌কা ঠিকা দেনে হ্যাম যাগা" এই বলিয়া চৌকিদার চাক্‌রী ছাড়িয়া জগৎ স্বামীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল। হিন্দু পাঠক! এ কয়দিন চৌকিদারের অনুপস্থিতিতে যে ব্যাক্তি ঠিকা দিয়াছেন, ঠিক সময়ে আসিয়া চৌকিদারের চাকরি বজায় রাখিয়াছিলেন, তিনি কে—তাহা কি আর তোমায় বুঝাইয়া দিতে হইবে? তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তের জন্য তিনি এইরূপ করিয়া থাকেন। এ কয়দিন সেই ভক্তাধীন ভগবান্ আসিয়া তাহার কার্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন। চৌকিদার বুঝিতে পারিয়া এইবার তাঁহার কার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিবে বলিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিল। সকল কার্য্যে ভগবান্ ভক্তের জন্য এইরূপই করিয়া থাকেন। ভক্তের জন্য তিনি বিষ ভক্ষণ করেন, অস্ত্রের আঘাত সহ্য করেন, তিনি যে ভক্তের চিরানুগত, ভক্তের নির্য্যাতন কি ভক্তবৎসল ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন? তা হ'লে যে তাঁর নামে কলঙ্ক হইবে। দেখ্ তন্ময় হ'তে শেখ্ কেবল মনটী ভগবান্‌কে দে, তিনি আর কিছুরই কাঙ্গাল নন্। সেই যে রে পণ্ডিত কি একটা শ্লোক বলেছিল।

ভক্ত। প্রভু! হাঁ মনে পড়েছে, সেদিন সেই পণ্ডিতজী বলেছিলেন—

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণা চ পদ্মা,
দেয়ং কিমস্তি ভবতে জগদীশ্বরায় ॥
আভীর-বাম-নয়নাহৃতমনসায়,
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ ॥

বামাচরণ। হাঁ হাঁ ঠিক্ ঠিক্! রত্নাকর সমুদ্র তাঁহার গৃহ, তুই ধনের জন্য যাকে ডাকিস্ সেই লক্ষ্মীই তাঁহার গৃহিণী, এমন ভগবান্‌কে কি দিবি, তবে আভীর-বাম-নয়না গোপীগণ তাঁর মনটী হরণ করেছে, তাঁকে সেই মনটী দিয়ে তুষ্ট কর। এরূপ কথাবার্ত্তায় রজনী প্রভাত হ'য়ে গেল। বামাচরণ বলিলেন— যারে যা রাত কাবার হ'য়েছে, আর বকাস্‌নে, কাল সমস্ত দিন কাদা ঘেঁটেছি, সকাল বেলাই স্নান ক'রে আসি। বলা বাহুল্য যে, সেদিন প্রভাতে আর আকাশে মেঘাড়ম্বর হয় নাই। আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যোদয় হইয়াছে। তারা মা পাগল ছেলের পূর্ব্বদিনের কথার সত্যতা রক্ষার জন্য বারিপাত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, আকাশ মেঘবিহীন করিয়া রৌদ্রের উত্তাপ প্রদান করিয়াছেন। ভক্তটী বামাচরণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। বামাচরণও দ্বারকা-নদীতে গিয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বামাচরণ জলে পড়িলে শীঘ্র উঠিতেন না; অদ্য খুব দূরদেশ হইতে একজন বিশিষ্ট জমীদার তারাপীঠে দেবীদর্শনে আসিয়াছেন। সঙ্গে

কয়েকজন লোক আসিয়াছেন, তাহারা বাসায় আছে। জমীদার দ্বারকানদীতে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছেন। বামাচরণ জমীদারের আহ্নিক দেখিয়া তাহার গায়ে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। কয়েকবার জলের ছিটা দিলে জমীদার বিরক্ত হইয় বলিলেন—আঃ কি কর! আমার আহ্নিকে বাধা দাও কেন?

বামাচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন— হাঃ হাঃ বড়ই ত' আহ্নিক ক'রছেন, মূর কোম্পানীর বাড়ী জুতো কিনছেন, জপ ক'রছেন। জমীদার অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি আহ্নিকের ভাণ করিয়া বাস্তবিক মনে মনে করিতেছিলেন—এখান হইতে কলিকাতায় যাইব, কলিকাতায় যাইয়া মূর কোম্পানীর বাটী জুতা কিনিয়া স্বদেশে যাত্রা করিব, তাঁহার মনে এই ছিল কিন্তু বাহ্যিক জপও করিতেছিলেন;—বামাচরণ অন্তর্য্যামী হইয়া তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন।

জমীদার ক্ষেপার অলৌকিক-প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সেই সিদ্ধপুরুষ বামাচরণের সঙ্গ লাভের জন্য কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু বামার সঙ্গলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। বামাচরণ কিছুতেই তাঁহাকে ধরা দিলেন না। জমীদার মহাশয় যাইবার সময় পাণ্ডাগণের নিকট তাঁহার প্রণামীর স্বরূপ অর্থাদি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বামাচরণ কাহারও কোন কথায় থাকিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে লোকের নিকট বসিতেন, না করিলে আপন খেয়ালে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, কাহারও কোন কথা বা বাধা মানিতেন না।

তবে যাহার উপর সদয় হইতেন, সে তাঁহাকে গালাগালি দিক্, আর যাই করুক, তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি প্রায়ই সকলকে শালা বা বেদো বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে কাহার প্রতি ঘৃণা বা বিদ্রূপ ভাব প্রকাশ পাইত না। তাঁহার স্বভাবই ঐরূপ ছিল। আবার যখন ভাল কথা বলিতেন, তখন তুমি বড় লোকই হও আর দরিদ্রই হও, বাপু বাছা মশাই, আজ্ঞে আসুন প্রভৃতি বলিতেন। পাগলের পাগলামী কখন কিরূপ ভাব ধরিত, তাহা বুঝা যাইত না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কাজের কথা।

আজ আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি, তারাপুরে মায়ের মন্দিরে মহাধূম লাগিয়া গিয়াছে। তারামায়ের মহাপূজা এবং মেলার আয়োজন হইতেছে, এ সময় দেশবিদেশ হইতে এখানে নানা লোকের সমাগম হইয়া থাকে; নানা প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। শুভ আশ্বিনে তারাপুরের এই মহোৎসবের তুলনা হয় না। কত সাধু, কত ভক্ত, কত যাত্রীর যে সমাগম হয়—তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই সময় আনন্দময় পুরুষ বামা-চরণের পূজারও বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে, নানা স্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চরণ দর্শন জন্য আসিয়া কয়েক দিন তাঁহার সহবাসে স্বর্গ-সুখানুভব করে।

প্রাতঃকাল হইতে আজ লোক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। কেহ বা দ্বারকানদীতে, কেহ বা অমৃতকুণ্ডে অবগাহন করিয়া পবিত্র অন্তঃকরণে মায়ের পূজা দিতেছে। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে তারা নাম উচ্চারণ করিয়া সমাগত জনসঙ্ঘের শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে-ছেন। এখানে সম্প্রদায় ভেদ নাই; শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই এখানে সমানভাবে সমাদৃত, সমানভাবে

পূজার আয়োজনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বামাচরণ সকাল হইতেই আজ ভক্তিরসে অভিষিক্ত, অনবরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন আর নাদগম্ভীর স্বরে মায়ের নাম উচ্চারণ করিয়া একেবারে প্রমত্ত হইয়া গিয়াছেন। আজ ক্ষেপা যেন ভক্তির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, কোন জ্ঞান নাই। পাগলের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ত' তাঁহার কোনকালেই ছিল না। আজ আবার যেন তাহা অপেক্ষা আরও হীনতা স্বীকার করিয়াছেন, আত্মহারা হইয়া আদরিণী মায়ের আদুরে ছেলে বামার হৃদয়ের মহৎ ভাব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ও বিশ্বাস দেখিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। আজ বামার হৃদয় প্রেমে ভরপুর; মন প্রফুল্ল, প্রাণ পবিত্র।

পীঠস্থান—তীর্থস্থান আর কিছুই নহে—কেবল ভক্তগণের পদার্পণে তাহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পীঠস্থান মাত্রেই অকপট অনুরাগী ভক্তের সমাগম বা তাঁহারা তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়াই তাহার মাহাত্ম্য এত অধিক। যে স্থানে ভক্ত আছেন, সাধক আছেন, হৃদয়ের পূজায় প্রাণের আহুতি দিয়া যেখানে তাঁহারা দেবতাকে জাগাইতে পারেন—তাহাই তীর্থস্থান; সেই স্থানেই দেবতা জাগ্রত হন, বরাভয় হস্তে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। জাগাইতে না পারিলে, দেবতার ধ্যান ধারণা করিয়া তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিতে না পারিলে তাঁহারা প্রসন্ন হন না।

ব্রহ্মের রূপ নাই অথচ তিনি সমস্ত রূপের আধার। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট বস্তু অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার বর্ণনা কেহ করে নাই। মুখে বা ভাষার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। তিনি যাহা তাহাই। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল—অটল। তাঁহার শক্তির দ্বারা জগতে সকল কার্য্য পরিচালিত হইতেছে; তিনি এক কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত। মাও আমার অনন্ত, সর্ব্বভূতে মা আমার ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। তাঁহার স্বরূপত্ব তাঁহাতেই বর্ত্তমান। মাই ব্রহ্ম, শক্তি আর শক্তিমানে যেমন অভেদ, তেমনি ব্রহ্মময়ীর সহিতও ব্রহ্মের সম্বন্ধ অভেদ। চিত্তশুদ্ধি করিয়া যিনি সর্ব্বভূতে আমার সর্ব্বেশ্বরী মাকে দেখিতে পারেন, তিনিই ধন্য। ছেলেদের কাদা ঘাটা তুমি যতই বারণ কর, কাদা তাহারা ঘাঁটিবেই। মা তাহাদিগকে অপরিষ্কার দেখিলে—তাহা ধৌত করিয়া দেন। দয়াময়ী জগজ্জননী, স্নেহের প্রাণময়ী প্রতিমা মা আমার ছেলেকে কাদা ধূলা মাখা দেখিলে, অমনি তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেন। মানুষ যতই পাপ করুক, পাপ-তাপ-নিবারিণী পতিতপাবনী নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধার সাধন করিবেন; কিন্তু তাঁহাকে ডাকিতে হইবে,—মা! আমি পতিত, আমাকে উদ্ধার কর, পতিত সন্তানের প্রতিইত' মায়ের দয়া বেশী।

তাই বলি—ভাই এস, তারাপুরে মায়ের নিকট আসিয়া তোমার প্রাণের বেদনা অকপট-চিত্তে প্রকাশ কর, মা তোমাকে কোলে স্থান দিয়া নিবেদন করিয়া দিবেন। তারপরে বামার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সেই আড়ম্বরবিহীন সাধন-

ভজনের ভাব উপলব্ধি করিয়া জীবনের পথ পরিষ্কার কর। বামাচরণ কখন বেশী লোকসমাগম ভালবাসিতেন না। বেশী লোকসমাগম হইলেই তাঁহার ক্ষতি হয়; লোকে তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করে। মাকে ডাকিবার বড়ই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়—তাই বামাচরণ একাকী থাকিয়া, নিভৃতে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া যে সুখ অনুভব করেন, সহস্রাধিক লোকের মাঝখানে মাতৃ-পূজার মহা আড়ম্বর হইলেও তাঁহার তাদৃশ সন্তোষ লাভ হয় না কিন্তু এ দিনে ত' আর তাঁহার সে আশা নাই; তাই বামা আজ প্রকৃত ক্ষেপিয়াছেন! কেবল চীৎকার করিয়া "তারা" নামে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন। এই সময় একদল ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে মায়ের মন্দিরে নাম গাহিতে লাগিল—

"আদর ক'রে হৃদে রাখ মন আদরিণী শ্যামা মাকে।
(ও মন) তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে॥
(ওরে) কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
(কেবল) রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে।
অজ্ঞান কুসঙ্গী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥
কমলাকান্তেরই মন, ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্রে পাইলে ধন, সে কি অন্যের কাছে রাখে॥"

গীতটী ঠিক বামাচরণের মনের মত হইতেছিল। "কেবল তুই দেখ্ আর আমি দেখি" এই কথাটী আজ ভক্তের প্রাণের গাথা, তাই তিনি দূর হইতে শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং

"বেঁচে থাক্‌রে শালারা" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেই দারুণ রৌদ্রে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মাতৃ-নামে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন। গাহকগণ গান শেষ করিয়া বামাচরণের পদধূলি গ্রহণ করতঃ ধন্য হইলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও কত লোক সেই তারানামে পাগল বামার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে বামাচরণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

বেলা হইলে মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। কত লোক পূজা দিতে, পূজা দেখিতে, মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রাণ জুড়াইতে আসিয়াছে, তারাপুরে আজ অসংখ্য লোক সমাগম হইয়াছে। পূজার বাদ্যধ্বনি—কাড়ানাকড়া, ঢোল, ঢাক, প্রভৃতির ভৈরব নিনাদে চারিদিক প্রকম্পিত হইতেছে। আরতির ঘোরতর ঘটা, কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ দেবীকে বাতাস করিতেছে, কেহ শঙ্খধ্বনি করিতেছে, কেহ কেহ "তারা শিবদারা" রবে সেই শ্মশান-সৈকত আনন্দে মুখরিত করিতেছে। মায়ের ভোগ হইয়াছে; কত লোক প্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহে দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে নাটোর রাজবাটীর পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই রাজবংশ চিরদিন ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের জন্য, দরিদ্র-সেবার জন্য তাঁহারা চিরদিনই মুক্ত হস্ত। তারাপীঠে নাটোর রাজবংশের এই কীর্ত্তি অতুলনীয়। মায়ের ভোগ ও বামাচরণের ভোগ দেওয়া হইল। মায়ের ভোগের পর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির

ভোজন হইয়া গেল। তারাদাস বামাচরণ আহারে বসিলে বাহনগুলিও তাঁহার সহিত বসিল। কুকুরে মানুষে একত্রে আহার,—অতি অপূর্ব্ব দর্শন। সাধারণ মানব হইলে এ আহারে হয়ত' পঞ্চত্ব পাইতেন; হয়ত' কুকুরের বিষে তাঁহাকে শমন-সদনে গমন করিতে হইত। বামাচরণের সে ভয় নাই, শমনের ভয় তাহার চিত্ত আলোড়িত করিতে পারে না। যে তারা মায়ের শাসনে শমন শশঙ্কিত, ব্যস্ত, ভয়-চকিত, ক্ষেপা বামা যে তাঁহারই দাস, তাঁহারই প্রিয়পুত্র, শমন তাহাকে কি করায়ত্ত করিতে পারে? বামাচরণ ত' সর্ব্বদাই বলিতেন—"মোরবো আর তারার চরণে মিশিয়ে যাব।"

এইরূপ আনন্দময়ীর আনন্দে সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইয়া গেল। বৈকালে আবার আনন্দের তুফান বহিতে লাগিল। বহু জাপক ভক্ত মায়ের মন্দিরে আসিয়া জপের সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। চারিদিকে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। মেলা বসিয়াছিল—কত লোক কত দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া গৃহে ফিরিতে লাগিল; কিন্তু এ মেলায় যাহাদের কেবল কেনাবেচা উদ্দেশ্য নহে, যাহারা কেবল পুত্র-পরিজনের জন্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৃথা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসে নাই; তাহারা বসিয়া বসিয়া মায়ের পাদপদ্মে প্রাণের ভক্তিকুসুম উপহার দিয়া সেই ভবারাধ্য চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ফেলিল। ভক্তির মূল্যে ভক্তাধীনা মাকে ক্রয় করিয়া আবার তাঁহারই চরণে আত্ম-বিক্রয় করিল। মরি মরি, এ বেচাকেনার কি তুলনা আছে? সাধক না হইলে

কি ভবের হাটে, এই মহামেলায় এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে লাভবান হইতে পারে ? এ মেলায় কিন্তু অনেক সাধক প্রভূত লাভ করিয়া নিজের সম্পত্তি বাড়াইয়া লইল।

আজ তারাপুরের চারিদিকেই সেই প্রাণারাম মাতৃ-নাম মহামন্ত্রে কর্ণকুহর পবিত্র হইতেছে, ভক্তের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে, প্রাণের স্পন্দন দ্রুতবেগে সমাহিত হইতেছে ; সাধক আজ আপন মনে সমাধিস্থ। সন্ধ্যাকালে মায়ের আরতির পর সমাগত সাধক মণ্ডলী বামাচরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বামাচরণ সুরাপান করিতেন। ইহা দোষ কি গুণ—তাহা আমাদের বলিবার ক্ষমতা নাই। সাধক চরিত্রের সমালোচনা করা নরকের কীট, সংসার-আবর্জ্জনার ঘৃণিত জীব আমাদের সাধ্য নাই। তবে তিনি লোকের সংসর্গ তত ভালবাসিতেন না, খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত না হইলে কাহাকেও আমল দিতেন না, পাগলের ভাণ করিয়া গালাগালি দিতেন। কখন মাতালেরও ভাণ করিতেন, সাধারণ লোকে এই অবস্থায় তাঁহাকে মাতাল বা পাগল বিবেচনা করিয়াই চলিয়া যাইত। কিন্তু আমরা জানি, অজস্র মদ খাইয়াও বামাচরণ মাতাল হইতেন না, আবার কখন কখন সামান্য পানে তিনি মত্ততার সীমা অতিক্রম করিতেন। বেশী লোক সমাগম হইলেই প্রায় এরূপ দশা হইত। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, লোকে যাহাতে তাঁহাকে ঘৃণা করে, কাছে আসিয়া বিরক্ত না করে—তিনি তাহাই ভালবাসিতেন।

তিনি সর্ব্বদাই বিভোর হইয়া মায়ের কোলে শয়ান থাকিতে ইচ্ছা করিতেন—আপনহারা হইয়া এরূপ থাকিতে পারিলে তিনি আর কিছুই চাহিতেন না। তাই তিনি সময়ে সময়ে গাহিতেন ঃ—

"আপনাতে আপনি থেকো।
যেও না মন কারু কাছে ॥"

কিন্তু সাধক! তুমি যতই প্রচ্ছন্ন থাকিতে, যতই গোপনে থাকিতে ইচ্ছা কর, এ ভারতবর্ষের ন্যায় ধর্ম্মের দেশে তুমি কিছুতেই তাহা পারিবে না। ফুল বনে ফোটে, বনই আলোকিত করে কিন্তু তাই বলিয়া কি ভ্রমর তাহার সন্ধান পায় না? ফুল ত' তাহার কাছে যায় না, তাহার চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দেয় না, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যস্তও হয় না, তবে ভ্রমর কেন—দেশ দেশান্তর হইতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়া তাহার মধু অপহরণ করে? ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুও সেই ভ্রমরের জাতি; পুষ্পরূপী সাধক তুমি যেখানেই থাক না কেন, কোথা হইতে গুন্ গুন্ করিয়া আসিয়া হিন্দু ভ্রমর তোমার নিকট হইতে তত্ত্ব-মধু সংগ্রহ করিবে; ভারত-জাত হিন্দুগণের ইহাই রীতি—ধর্ম্মের নামে তাহারা এইরূপই পাগল। তবে তারাপীঠের শ্মশানে আসিয়া হে সাধক-শ্রেষ্ঠ, তোমার চরণামৃত তাহারা পান করিবে না কেন? লুকাইবে বলিলেই কি লুকাইতে পার?

ভক্তগণ আসিয়াছেন দেখিয়া, বামাচরণ প্রথমে অনেক ভাণ করিলেন কিন্তু তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। কাজেই তাঁহাকে আসিতে হইল। ভক্তগণ মণ্ডলী করিয়া বামাকে মধ্যস্থলে

বসাইলেন। তাহার মধ্যে নানা প্রকারের সাধক আছেন, আজ তারাপীঠে সাধকের সমন্বয় হইয়াছে, অভেদ অন্তঃকরণে তাই আজ সকলে একত্রে মিলিয়াছেন। প্রথমে হরি-সংকীর্ত্তন, কালী-কীর্ত্তন হইল। ক্ষেপা প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া টলিতে লাগিলেন। কটিদেশের বসন শ্লথ হইয়া পড়িয়া গেল, নগ্ন অবস্থায় বামা নাচিতে লাগিলেন—কোন জ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে বসিয়া পড়িলেন, গান থামিল। তখনও বামাচরণ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, ক্রমে সংজ্ঞা লাভ হইল।

একজন বলিলেন—বাবা! আপনি কাপড় পরিবেন কি, আনিয়া দিব ?

বামাচরণ বলিলেন—না বাবা! কাপড় আর কোমরে থাক্‌বে না ; আর থাক্‌বেই বা কেন ? আমার বাবাও কাপড় পরে না, মাও পরে না ; ছেলের অভ্যাসও ত' সেরূপ দুরস্থ হওয়া চাই! আর দেখ, কাপড় প'রে আসি নাই, যাইবও না ; তবে আর তার জন্য এত ব্যস্ত কেন। লোকালয়ে থাক্‌লে বরং দরকার হয় ; তা আমি ত' আর লোকালয়ে থাকি না—যাইও না।

অপর ভক্ত। বাবা! ছেড়ে দিন ও বাজে কথা ; ও নিয়ে অত কথা কেন, ও কি আবার একটা কথার মধ্যে ?

বামাচরণ। হাঁ বাবা! তাই বল্‌ছি—আমার মা তারাদেবী ও বাবা চন্দ্রচূড় ত' নেংটা। তবে আমার অত বাবুয়ানা কেন ?

একজন ভক্ত। আচ্ছা বাবা! ইন্দ্রিয়গণের দ্বারস্বরূপ

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হয় ?

বামাচরণ। হাঁ বাবা! তা হয় বটে, তবে সব জ্ঞান ঐ পাঁচেতে হয় না। বাহ্যজ্ঞান ঐ পাঁচেতে হয় বটে কিন্তু অন্তরের অনেক জ্ঞান উহাতে হয় না, তখন মনকে আর একটি ইন্দ্রিয় ধ'র্ত্তে হয়। নতুবা সে সব জ্ঞান লাভের উপায় নাই।

ভক্ত। আচ্ছা বাবা! মানুষের প্রকৃতি অনেক রকমের—সাধকের সাধনাও সেই অনুসারে হয় তো ?

বামাচরণ। দেখ্, তোরা অত বিদ্‌কুটে কশ্চেন আমায় করিস্ কেন ? আমার কি অত বুঝবার ক্ষমতা আছে বাবা, আমি যে মুখ্যু।

ভক্ত। বাবা! আশীর্ব্বাদ করুন; আমরা যেন আপনার মত মুখ্যু হ'য়েই জন্মাতে পারি। আমাদের মত পণ্ডিত হ'য়ে কাজ নেই। আমাদের মত পণ্ডিত কখন সিদ্ধিলাভ ক'র্ত্তে পারে নাই।

বামা। বাবা! মানুষ তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক প্রকৃতির। সাধকও ঐ তিন শ্রেণীর। তামসিক সাধক কিছুই নহে, তারা বাহ্যিক নাচ, গান, তামাসা, বলিদান প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কাজের বিষয়ে কিছু নয়। পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে এইরূপ হয়। এ জন্মে যাহারা খুব অগ্রসর হ'য়ে থাকে, প্রবৃত্তি শেষ ক'রে ফেলে, পরজন্মে তাহাদের সাত্ত্বিক ভাব হয়—সে জন্মে আর তাহাদের প্রবৃত্তির জো থাকিতে হয় না। রাজসিক ভাব—প্রবৃত্তি-মার্গ, ইহাহই

শাক্তগণের সাধনা, ইহার পরই যে কৈলাসে উঠ্‌বে—সে কৈলাস থেকে আর নামতে হবে না। পাশ হ'য়ে যাবে, কিন্তু বাবা! তান্ত্রিক সাধনায় অনেকেরই পতন হয়—তাহারা ভোগেই মজে থাকে। যার জন্য ভোগ—তার সহিত যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে না। সেই শালারাই তো তন্ত্র শাস্‌তোরটাকে নষ্ট কর্‌লে।

প্রবৃত্তির শেষ হ'য়েছে, অথচ সাত্ত্বিক ভাব এলেই হয়—এই অবস্থাপন্ন যাহারা তাহারাই রাজসিক ভক্ত। কুলাচারী বা বীরাচারী যাহারা, তাহাদের সমস্ত ঠিক হ'য়েছে—ছাড়লেই হয়। এ অবস্থা থেকে পতনও হয়—আবার উন্নতিও হয়। সবই বাবা, তারা-মায়ের খেলা, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

এই সময়ে মায়ের মন্দিরে কয়েকজন সন্ন্যাসী মায়ের নাম গান করিতে আসিলেন। ভক্তগণ বামাচরণকে লইয়া মায়ের মন্দিরে গমন করিলেন। বামাচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—কিগো বেটি। ছেলে পড়ে রইলো একধারে আর মা এখানে খেয়ে দেয়ে বেশ আনন্দ কচ্ছে। এই কি মায়ের ধারা? বামার কি ভাব মনোমধ্যে উদিত হইল, বলিলেন—যাও যাও, আর তোমার আদরে কাজ নাই। "বামা, বামা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি, হাঁরে সমস্ত দিন যে তোকে মন্দিরে দেখ্‌তে পাইনি। এত বারফটকা হ'য়েছিস কেন! এখন কাছে এসেছি ব'লেই বুঝি মায়া উথ্‌লে উঠলো। থাক্ থাক্ আর তোমার আদর ক'র্ত্তে হবে না।" বামাচরণ মায়ের সম্মুখে আসিয়া অসামঞ্জস্য ভাবে এইরূপ বকিতে লাগিলেন। তাহাতে

তারা মায়ের সেই হাস্যবদন যেন কথঞ্চিৎ বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। ভক্তগণ পাগলকে মায়ের সহিত ঝগড়া করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে "তারা" নামে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। নামের পাগল বামাচরণ আবার সকল ভুলিয়া নামসাগরে ডুবিয়া পড়িলেন। মায়ের মূর্ত্তিও আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। এইরূপে ভক্ত-মণ্ডলী মাতৃ-সন্নিধানে সেই সুখের রজনী অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। পাগল কখনও অস্ফুট স্বরে আপন মনে কত কি বকিতেছে; তখন দৃষ্টি ফ্যালফেলে, কারু দিকে নজর নেই। দেখিলে মনে হয় যেন কোন সরল শিশু মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণের পর সাক্ষাৎ হওয়ায় কত অভিমান করিতেছে, কত আব্দার করিতেছে। আবার কখনও একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তারস্বরে "তারা" "তারা" করিতেছেন আর বলিতেছেন—"ওরে শাস্তর টাস্তর রেখে অনবরত নাম কর, নাম ভিন্ন গতি নাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুইটী ঘটনা

বীরভূম জেলার মধ্যে তারাপীঠ অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বশিষ্ঠারাধিতা তারাদেবী ও চন্দ্রচূড় মহেশ্বর এই স্থানের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই স্থানের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া কত শত মহাপুরুষ যে সংসার-ত্যাগী হইয়া এখানে ভগবৎ-চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। সাধকোত্তম রাজা রামকৃষ্ণ হইতে স্বর্গীয় বামাচরণ পর্য্যন্ত মহাত্মাগণ এই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়া স্থানের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। তারাপাঠ তন্ত্রোক্ত মহাপীঠ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে, তন্ত্রে আছে—

"তারাপুরং মহাপীঠং
গন্তব্যং যত্নতঃ সদা॥"

কথিত আছে—এখানে সতীদেবীর নয়নের তারা পতিত হইয়াছিল। এখানে সে সকল বিষয় বিবৃত করিবার স্থান নহে। অদ্য বামাচরণের আরও দুইটী ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে। একদিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, গ্রীষ্মকাল। রবির প্রচণ্ড উত্তাপে যেন সমস্ত জগৎ পুড়িয়া যাইতেছে। রামপুর-হাটের শ্রীযুক্ত হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিকারোহণে কোন

দূরতর গ্রাম হইতে তারাপুর দিয়া রামপুরহাট অভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহার শিবিকা তারাপুরে বামাচরণের কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া বামাচরণকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন। তারপর হরিতারণ বাবু বিদায় লইতে উদ্যত হইলে বামাচরণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া একটু জলযোগ করিতে বলিলেন। ভয়ঙ্কর রৌদ্র, বিষম উত্তাপ, এমন সময়ে হরিতারণ বাবুর যাওয়া হইতে পারে না; কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দিবাবসানে তাঁহার যাওয়া উচিত। বামাচরণ এই ভাবের কথা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হরিতারণ বাবু ইহাতে একটু বিস্মিত হইলেন। এমন কথা বামাচরণ তাঁহাকে কখন বলেন নাই। এত অনুরোধ ত' তিনি কখন কাহাকেও করেন না। হরিতারণ বাবু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার ত' বাটী যাওয়ার বিশেষ আবশ্যক। তথায় তাঁহার একটী অল্প বয়স্কা কন্যা পীড়িতা আছে। বামার কথায় তাঁহার মন মানিল না। তিনি "বামাক্ষেপার" কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় শিবিকায় আরোহণ করিতে দ্রুত চলিলেন। বামাচরণ কিন্তু সেদিন হরিতারণ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিতারণ বাবুর মন তখন বাটী যাইবার জন্য, পীড়িতা কন্যাটীকে দেখিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তিনি বামাচরণের সানুনয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিছুতেই নিজে হরিতারণ বাবুকে নিরস্ত করিতে

পারিলেন না দেখিয়া, বামাচরণ কাতরভাবে পথের পথিককে অনুরোধ করিতে বলিলেন—"উহাকে ফিরাও, বড় রোদ একটু জল খাইয়া যাইতে বল।" হরিতারণবাবু কিছুতেই ফিরিলেন না, তিনি পাগলের খেয়াল মনে করিয়া সমস্ত কথা অবহেলা করতঃ চলিয়া গেলেন। রামপুরহাটে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক বন্ধুও তাঁহাকে পাল্কী হইতে নামিতে বলিলেন। তিনি কিছুতেই নামিবেন না, বন্ধুও ছাড়িবে না। বন্ধু তাঁহাকে পাল্কী হইতে নামিয়া জলযোগ করিতে বলিলেন। হরিতারণবাবু এখানেও ততোধিক বিস্মিত হইলেন। আজ আমায় জল খাওয়াইবার জন্য সকলের এত অনুরোধ কেন? ক্ষেপাও সেখানে ক্ষেপিয়াছিলেন, এখানেও আবার ইনি অনুরোধ করিতেছেন। এরূপ সময় এরূপ অনুরোধের কারণ কি? আর দুই চারি মিনিট পরেই তিনি ত' বাটী পৌঁছিতে পারিবেন; তবে জলযোগের জন্য এত অনুরোধ কেন? এবার এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা অনুরোধে পড়িয়া এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় মথিত হইল। বামাচরণের অত অনুরোধ, অত আগ্রহের কারণ সমস্তই তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কন্যাটী সেই দিন বেলা দশটার সময় অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে।

বেলা এগারটার সময় আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী তারাপুর গ্রামে বামাচরণের নিকট সে সংবাদ কখন যাইতে পারে না। অথচ সেই সাধুপুরুষ যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া, বাটী গেলে

হরিতারণ বাবুর নিশ্চয়ই খাওয়া হইবে না; অন্তরঙ্গ ভক্ত হরিতারণের কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া উদার-প্রকৃতি, ভক্তপ্রাণ বামাচরণ তাঁহাকে অত অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হরিতারণ বাবু পুনরায় তারাপুর দিয়া যাইতেছিলেন। বামাচরণ বলিলেন—"বাবা! বড় রোদ, বড় কষ্ট হয়েছিল।" হরিতারণ বাবু লজ্জায় অধোবদন হইয়া প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বামাচরণ সর্ব্বভূতেই বিভুর অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেন। সে বিষয়ের একটী ঘটনা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত। সে অধিককালের ঘটনা নয়। প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইতে চলিল, একদা পুরোহিত অভাবে ৺তারামাতার পূজা নির্ব্বাহ হইতেছে না দেখিয়া তৎকালীন মন্দিরের নায়েব ৺নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পর পুরোহিত ঠাকুর বাটী গিয়াছেন। পরদিন প্রত্যূষেই তাঁহার আসিবার কথা কিন্তু দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। সে সময় পুরোহিতও মিলে না, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনন্যোপায় হইয়া সেদিনকার পূজা বামাচরণের দ্বারা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুসারে তদীয় চরণ-সমীপে উপনীত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নির্ব্বিকার যোগী বামাচরণ প্রাগুক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া পূজা করিবার জন্য আপন কুক্কুর কুক্কুরী পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মন্দিরে উপনীত হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়-কন্দরে কি এক নূতন ভাব-তরঙ্গের আবির্ভাব হইল। নয়নযুগল ভাবাবেশে ঢলঢল হইয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, দেহ অবসন্ন হইয়া গেল এবং কটিদেশ হইতে গৌরিক-রাগ-রঞ্জিত কৌপীন মেখলা চ্যুত হইয়া পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তারা তারা বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তিনি স্বর্গে আছেন কি মর্ত্ত্যে আছেন, আনন্দে কি বিষাদে আছেন, তাহা তিনিই জানেন। কখনও বা হৃদয়মধ্যে তাঁহার পরমারাধ্যা মাতাকে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া ভক্তিরসে বিভোর হইতেছেন, কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় কত কি প্রলাপ বাক্য মৃদুমৃদু উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে বিপুল ভগবৎ-প্রেম ধরিতেছে না। যেন নদী উচ্ছলিত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিতেছে। আহা মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব ভাব! সে ভাব যে দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে। ভাবার কি সাধ্য যে তাহা বর্ণনা করিতে পারে?

এইরূপ ভক্তিভরে গদগদ হইয়া বামাচরণ ৺তারামাতার পূজা আরম্ভ করিলেন। সে পূজায় ওঁকার নাই—তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র নাই—প্রাণায়াম নাই—ভূতশুদ্ধি নাই—অঙ্গন্যাসাদি নাই—আসনশুদ্ধি নাই—জলশুদ্ধি নাই—শাক্ত তিলক নাই—এমন কি স্নান পর্য্যন্তও নাই, আছে কেবল হৃদয়ে ভক্তি, মুখে তারা নাম, আর হস্তে বিল্বপত্রের অঞ্জলি—এই তিনটী সম্বলের বলে আজ ভক্তের সহিত ভক্তবৎসলার মধুর মিলন সংঘটিত হইল।

এইবার তাঁহার অপূর্ব্ব পূজার কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া অদ্যকার ভক্তিভাবের নিদর্শন দেখাইব। এই অভিনব পূজার বিবরণ শুনিয়া পাঠকগণ আপাততঃ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না সত্য, কিন্তু গভীর চিন্তার চক্ষে দেখিলে বুঝিবেন, তাঁহার পূজাই প্রকৃত পূজা। যদি বলেন—তিনি স্নান ও তিলকাদি ধারণ না করিয়া কিরূপে শুচি হইলেন? ইহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে মানস-স্নানের ব্যবস্থা আছে। ঈশ্বরের নাম গ্রহণই মানস-স্নান। বামাচরণ পবিত্র তারা নাম স্মরণ করতঃ মানস-স্নানে দেহ পবিত্র করিলেন, অথবা তাঁহার ন্যায় ভক্ত সর্ব্বদাই পবিত্র, স্নান করিয়া পবিত্র হইবার তাঁহার আবশ্যক হয় না। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভক্তিভরে মাকে ডাকিয়া থাকেন, যে বামাচরণ মায়ের প্রিয় সন্তান, মা যাহাকে অগ্রে আহার না দিয়া নিজে আহার করেন না, মায়ের পূজার জন্য তাঁহার আর শুচির প্রয়োজন কি? একবারমাত্র রাম নাম উচ্চারণে রত্নাকরের যখন হিংসা-পাপ-কলুষিত হৃদয়ও পবিত্র হইয়াছিল, তখন পরমভক্ত বামার আর বাহ্যস্নানে শুচি হইবার প্রয়োজন কি? যাহা হউক, এইবার বামা মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিলেন—"এই বেলপাতা লে মা! এই অন্ন লে, এই জল লে, এই বলিদান লে, এই ফুল লে, এই ধূপ লে" এই বলিয়া সমস্ত পূজোপকরণ একে একে তিনি নিবেদন করিলেন ও শেষে "গোমস্তা বাবা লও, পাণ্ডা বাবারা লও, বেণী বাবা লও, রাম বাবা লও, অমৃত বাবা লও, কালাচাঁদ বাবা লও" এই বলিয়া এক একটা পুষ্পাঞ্জলি তারা বাটী

সংশ্লিষ্ট সকল কর্ম্মচারিদিগের নামেও প্রদান করিলেন। তৎপরে পূজার ছাগবলিও ঐরূপ অভিনব প্রথায় উৎসর্গীকৃত হইল। পূজা সমাপনান্তে বামাচরণ আপন কুটীরে ফিরিলেন। দর্শকবৃন্দ পূজার এই নূতন প্রথা সন্দর্শন করিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভাবগ্রাহী ব্যক্তি ব্যতীত সেই মহাতত্ত্বজ্ঞানী সাধক-প্রবরের হৃদয়ের সারবত্তা অনুভব করা সহজ-সাধ্য নহে। বামাচরণ ৺তারামাতার অস্তিত্ব সর্ব্বভূতে অনুভব করিতেছিলেন, তাই আজ তিনি কর্ম্মচারীসকলের নামে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও পূজা করিয়া প্রকৃত তারামাতার পূজা করিলেন। ভক্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান আপনিই আসিয়া থাকে। এই জন্য বলিতে হয়—মায়ের দয়া তিনি যে বিশেষ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

বামাক্ষেপা মহাপুরুষ, মহাভক্ত, ভক্তিবলে সাধনার চরম-সীমায় উন্নীত; সুতরাং তাঁহার এ পূজা-পদ্ধতি আমাদের অনুকরণীয় নহে। শাস্ত্রে পূজার দ্রব্য নিবেদন করিবার পূর্ব্বে তাহার অর্চ্চনা করিবার বিধি আছে। প্রত্যেক দ্রব্যটী সত্ত্বাযুক্ত ভাবিয়া তাহাকে গন্ধ-পুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়, তাহার অধিপতি দেবতাকে পূজা করিতে হয়। বামাক্ষেপা মহাভক্ত, সুতরাং এ তত্ত্বজ্ঞান-স্বতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভাবান্তর।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বামাচরণের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। যে বামাচরণ কাহারও সঙ্গ করিতে ভাল বাসিতেন না, লোকে কাছে আসিলে যিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন, চিতার প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হাতে করিয়া সঙ্গকরণেচ্ছু ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিতেন, ধরা ছোঁয়া দিতে একেবারেই যিনি ভাল বাসিতেন না, কেবল নির্জ্জনে থাকিয়া আপন ভাবে বিভোর থাকিতেন। এখন সেই বামাচরণ অতিশয় নম্র প্রকৃতি হইয়াছেন, কেহ আসিলে আর সেরূপ উগ্রমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন না, তাঁহার সঙ্গ লাভের ইচ্ছা করিয়া আসিলে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, ভক্ত আসিলেই বলিতেন—কি হুকুম বাবা? তদুত্তরে যদি কেহ বলিত—প্রভু! আপনার চরণ-ধূলা লইয়া পবিত্র হবো বলে এসেছি। বামা বলিতেন—বাবা! আমি প্রভু হবার উপযুক্ত নই, আর মানুষে মানুষের চরণ-ধূলা নিয়ে পবিত্র হ'তে পারে না, যদি পবিত্র হ'তে চাস্ যদি সকল ভাবনা এড়াতে চাস্‌তো যা না মন্দিরে, আমার মা আছেন, তাঁর পায়ের ধূলা নিগে যা; বিধি বিষ্ণু যার ধূলা নেয়, ভোলা যার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি

খায়, সেইখানে যা না, তাহা হইলে আর এমন ক'রে আসা-যাওয়া ক'র্ত্তে হবে না—সব সন্দেহ মিটে যাবে, পাগলের কাছে কেন বাবা! যদি কেহ বলিত—বাবা! আপনার কাছে বস্‌তে দোষ আছে ? ক্ষেপা অমনি অতীব নম্রভাবে বলিতেন—না বাবা, তাতে আর দোষ কি ? অনেক দূর থেকে যদি এসে থাক, একটু বসো, কিন্তু জলটল খাবে কি ? অধুনা ক্ষেপার এই সকল নম্রতা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইত।

এইরূপ ভাবান্তর হইবার কারণ সম্বন্ধে শুনা যায়—বামাচরণ মাকে পূজা করিয়া আসিবার পর, সকলে তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করিতে বলে; বামা কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হন না, বলেন রোজ রোজ অত করে খোসামোদ আমি ক'র্ত্তে পারবো না; আর আমার ওসব ঠিক ঠিক হয়ও না, ঐ মূর্ত্তির তলায় বস্‌লেই আমি সব ভুলে যাই; মন্ত্র তন্ত্র ত' কোন ছার—তাত ভাল জানিই না, আমি নিজেকেই ভুলে যাই, খুঁজিয়া পাই না—এমন হ'লে কি পূজা হয় ?

তান্ত্রিক সাধকগণের নিরম্বু উপবাসাদি কিছুই নাই; এমন যে শিবরাত্রির ব্রত—তাতেই তাহাদের অহোরাত্র নিরম্বু উপবাস নিষেধ, তবে পারে যদি ত' দোষ নাই। একদিন শিবরাত্রির দিন সকলেই ক্ষেপাকে বলিল—আজ আপনাকে পূজা ক'র্ত্তে হবে ক্ষেপার সে দিন ভাব-সমাধির দিন; আনন্দময় পুরুষ মাতৃ ভাবে বিভোর হইয়া মায়ের চরণামৃত পান করিবে, আজ কি কখন বাহ্যিক পূজা তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তিনি রাজী হইলেন না।

সেই রাত্রে সকলে পূজা করিয়া চলিয়া যাইবার পর বামাচরণ মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্য কোন লোকজন ছিল না; মাতা-পুত্রে নির্জ্জনে কি কথা হইল—আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম, তবে রজনীযোগে যে ভয়ানক কলহ হইয়াছিল—তাহা বেশ বুঝা গেল। পরদিন প্রাতঃকালে বামাচরণ একাকী বসিয়া নাট-মন্দিরে কাঁদিতেছিলেন। এমন সময় প্রধান পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন—প্রভু! কি হ'য়েছে, কাঁদ্‌ছ কেন?

পাগল ঠিক বালকের ন্যায় আপনার গালে আঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল—তো শালারাই ত' আমাকে নষ্ট করলি; আমাকে মার খাওয়ালি? এই দেখ কি হ'য়েছে; এইবার আমি তোদের কাছ থেকে সরবো—মা আর আমাকে এখানে রাখ্‌বেন না, এই বলিয়া পাগল একেবারে দৌড়িয়া মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করিল; বিড় বিড় করিয়া কত মনের কথা বলিল, মাকে প্রফুল্ল করিয়া আবার দৌড়িয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল। এই দিনের পর হইতেই বামাচরণের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

শিবরাত্রের পরদিন দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ, তাই কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত আজ ক্ষেপার নিকট বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাধুচরণ নামে একব্যক্তি ক্ষেপার বড় প্রিয়পাত্র ছিল; পুত্রের দীক্ষা প্রদান সম্বন্ধে সে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বাবা! ব্রাহ্মণের আবার স্বতন্ত্র দীক্ষা নেবারি দরকার কি?

ক্ষেপা। বৈদিক যুগে, কি পুরাণের যুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে ব্রাহ্মণের সাবিত্রী-দীক্ষা, উপনয়নাদি সংস্কার হইলেই হইত, স্বতন্ত্র তান্ত্রিক দীক্ষার দরকার হইত না, তখন ত' ব্রাহ্মণ পাপনিরত হইয়া এত শক্তি হারায় নাই—তাই তাতেই সব হ'ত।

ভক্ত। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ মাত্রেই ত' শাক্ত, সাবিত্রীই আদ্যা শক্তি। সকলেই ত' ঐ শক্তি চায়।

ক্ষেপা। শক্তি আবার কে না চায়? যে না চায়, সে ত' মরা মানুষ, শক্তি ভিন্ন কি কোন কাজ হয়?

ভক্ত। আচ্ছা বাবা! এই তান্ত্রিক দীক্ষাটা কবে থেকে প্রচলিত হ'লো।

ক্ষেপা। আবার তোরা পাকামো আরম্ভ করলি, ওসব শুনে কি হবে, আর আমি কি তোদের জন্য আবার এখন পাঠশালে যাব নাকি? আমার কি শাস্ত্রটাস্ত্র জানা আছেরে যে তোদের বল্‌বো। এ সকল জান্‌তে হ'লে তোরা কোন পণ্ডিতের কাছে জান না কেন?

ভক্ত। তারা পণ্ডিতি ক'রে বুঝায়, তাতে প্রাণে তত শান্তি পাওয়া যায় না—তারা আপনার মত বুঝাতে পারে না।

ক্ষেপা। তা আমার ত' শাস্ত্র দেখে শুনে কিছু জ্ঞান হয় নি, আমার মনে যা উদয় হয়—তাই পাগলের মত বলি। এ সকল কথা যদি ভুল হয়—শাস্ত্রের সঙ্গে না মিলে?

ভক্ত। আপনার প্রাণে যা উদয় হবে—তা শাস্ত্র ছাড়া উদয় হবে না। আচ্ছা বাবা! তান্ত্রিক-দীক্ষা আবার নিতে হয় কেন—বলুন না?

ক্ষেপা। দেখ, বামুনদের যেদিন থেকে অধঃপতন হ'য়েছে —যেদিন থেকে তারা সীতাদেবীর শাঁপে কলির বামুন হ'য়ে জন্মেছে, সেইদিন থেকেই এই নিয়ম। গুরুরূপে একজন মহা শক্তিশালী পুরুষ দীক্ষারূপ তান্ত্রিক-শক্তির দ্বারা ঠেলে না দিলে তারা জীবনের পথে যেতে পারে না; পদে পদে হুঁচুটে পড়ে। কেন, সেদিন আমি কার সাক্ষাতে মন্ত্র-গ্রহণের কথা একটু বলেছিলুম তো?

ভক্ত। সেদিন আমি ছিলাম না। আচ্ছা বাবা! সে কত দিন?

ক্ষেপা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর থেকে বেশ শক্তিহীন হ'য়েছে, আর সেই হ'তে আমাদেরও অধঃপতন হ'য়েছে। অবতার গ্রহণও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

ভক্ত। বাবা! অবতার গ্রহণ বন্ধ হ'য়ে গেছে কি রকম?

ক্ষেপা। অবতার তিন রকম—স্বরূপে, অংশে আর কলায়। স্বরূপে নয়টা অবতার হওয়া, দ্বাপরেই সমস্ত শেষ হ'য়ে গেছে; কলির শেষ মাত্র কল্কি-অবতার বাকী।

ভক্ত। অংশাবতার কি ঠাকুর?

ক্ষেপা। শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি?

ভক্ত। কলাবতার কাহারা?

ক্ষেপা। ভক্ত বা সাধকসম্প্রদায়কে কলাবতার বলা যায়।

ভক্ত। আচ্ছা প্রভু! শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর প্রভৃতি কি শাক্ত ছিলেন?

ক্ষেপা। এই ত' তুমি শুন্‌লে গো যে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত; আর শাক্ত না হইলে কি রাধা রাধা ব'লে চৈতন্য কেঁদে অচৈতন্য হ'য়ে পড়তো? অত অল্প বয়সে কি, দেশটাকে মাতিয়ে দেবার শক্তি হ'তে পার্‌তো, শঙ্কর বার বৎসরে পণ্ডিতীতে দিগ্বিজয় ক'রেছিল—একি পূর্ণ শক্তিমানের পরিচয় নয়? রামানুজ প্রভৃতিরও যে তাই; কলিতে যারা সাধক হ'য়েছে—তাদের কে না শাক্ত? কলিতে শক্তি উপাসনা আর শ্রীকৃষ্ণের নাম রসনায় রটনা ভিন্ন যে মুক্তির উপায় নাই।

সর্ব্বেশ্বর নামে আর একজন ভক্ত বলিল—গুরুর কাছে ত' তান্ত্রিক-দীক্ষা নিতে হবে ব'ল্লেন; তা তেমন গুরু পাই কোথা?

ক্ষেপা। গুরু নির্ব্বাচন ক'র্‌তে হবে—এই জন্য শাস্ত্রে ত' গুরু ও শিষ্যের নির্ব্বাচন বিষয় লেখা আছে, কিরূপ গুরু ক'র্‌তে হবে।

সর্ব্বেশ্বর। তবে কুলগুরু যদি ভাল না হয়—তাহ'লে তাকে ছেড়ে দেবো?

ক্ষেপা। বাপ্‌রে, তাও কি ক'র্‌তে আছে; তাহ'লে নির্ব্বংশ হবে, কুলগুরু কেউ ছেড়োনি বাবা, সে মূর্খই হউক, আর পণ্ডিতই হউক।

ভক্ত। বাবা! যদি তিনি কিছু না জানেন—তবে তাঁর দ্বারা কি কাজ হবে?

ক্ষেপা। ওরে, সে কিছু জানুক, আর নাই জানুক; তোর চৌদ্দপুরুষের খবর ত' সে জানে; তার বাপ দাদা ত' বরাবর

তোদের মন্ত্র দিয়েছে—সে যেমন তোদের কুলের কাহিনী নাড়ী-নক্ষত্র জানে, তেমন কি নূতন লোক জান্‌বে? তিনি বীজটী তোকে দিয়ে দেবেন—তারপর তুই ত' কাজ ক'র্‌বি, ভক্তিভরে জপ্‌ ক'র্‌লেই সব হবে—সে যে ভক্তের গোলাম রে শালারা? এত অবিশ্বাস কেন, কাঁদ্‌না ভক্তিভরে ডাক্‌না, তখনই দেখ্‌তে পাবি, অত তর্ক-বিতর্ক কেন?

সর্ব্বে। আচ্ছা ঠাকুর! তবে গুরুর দরকার?

ক্ষেপা। খুব! অন্ধকার জীবন-পথ বড় কাঁটা দেওয়া; তাই একজন জানা লোক, সেই পথের সন্ধান না ব'লে দিলে জান্‌তে পারবিনি, আগেকার মত তেমন জানাশুনা নেই—সেদিন চলে গেছে।

সর্ব্বে। গুরু যদি নিজেই না জানেন?

ক্ষেপা। গুরু আর তোর দেবতা যে এক, এ যদি তোর মনে বিশ্বাস থাকে, আর যদি অকপট হৃদয়ে ডাক্‌তে পারিস্‌—তাহ'লে তোর মনের সন্দেহ যে কেমন ক'রে ঠিক হ'য়ে যাবে—তা ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি, এখন থেকেই এত চঞ্চল হ'তে হবে না।

ভক্ত। আচ্ছা! বীজমন্ত্র জপ কেন ক'র্‌তে হয় আমি যদি শুধু নাম জপ্‌ করি?

ক্ষেপা। মূল ধরে টান্‌লেই সব পাওয়া যায়? বীজই যে দেবতা; তোকে গুরু যে বীজটী দেবেন, তোর জন্ম-বীজ তার সঙ্গে এক হ'লেই ফল হবে, যদি ফল না হয়—জান্‌বি ঠিক হয়

নাই। এইজন্য কুলগুরু চাই; কারণ সে তোর সব জানে। যদি কুলগুরু না থাকে, নূতন গুরু ক'র্ত্তে হ'লে উভয়ে এক বৎসর বসবাস ক'রে, খুব জেনে শুনে তবে ক'র্ত্তে হয়।

একজন ভক্ত কলিকাতা থেকে গিয়াছিলেন—তিনি ব'ল্‌লেন—গুরুমন্ত্রের কথা বেশ বুঝা গেল—আচ্ছা ঠাকুর! এই আমাদের শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের একটা ব্যবস্থা আছে—ওটা কি?

ক্ষেপা। আঃ মলো। এ আলোপেয়েটা আবার কোথায় ছিল রে; শালারা খালি বকাবে।

ভক্ত। বাবা মৌচাকে কাটি না দিলে কি মধু পাওয়া যায়?

ক্ষেপা। ওঃ শালা ত' খুব মৌচাক ঠাউরেছে? এতে মধু কোথা, এ যে নীরস্বে।

ভক্ত। বাবা! এরূপ নীরস হ'তে পার্‌লে ত' হয়। বলুন বাবা আপনার পায়ে পড়ি।

ক্ষেপা। দেখ্ তোরা যতই বল্, আমি কিন্তু সন্ধ্যে হ'লে আর থাক্‌বো না, তোরা যদি তখন সঙ্গে থাকিস্ তাহ'লে দেখ্‌তে পাবি মজা।

ভক্ত। না বাবা, আমরা আর বিরক্ত ক'র্‌বো না। বলা বাহুল্য, শিবরাত্রের পর হইতে ক্ষেপা অনেকটা নম্র হইয়া সকলের সঙ্গ ক'র্‌তেন, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লে আর কোথাও থাক্‌তেন না; নিজের আসনে গিয়ে ব'স্‌তেন, আর কালু কুকুরকে প্রহরী রাখ্‌তেন যেন আর কেউ না আসিয়া বিরক্ত করে।

ক্ষেপা একবার নাদ সুরে তারা নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতে

আরম্ভ করিলেন। দেখ! প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের বিধান—উহা ক'র্‌লে, পাপ কতক পরিমাণে ক্ষয় হয়—মনটাতে অনুতাপ না হ'লে ত' কেউ প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ত্তে চায় না। অনুতাপে অনেকটা কম হ'য়ে যায়—আর একটা উপকার হয় এই যে মনটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়—আগুন ঢুক্‌লে যেমন কয়লার ময়লা নষ্ট হয়—তেমন অনুতাপ বা বিবেক ঢুক্‌লে মনটা ময়লাশূন্য হয়—আর পাপকাজে মন যায় না। নতুবা একেবারে ক্ষয় হ'লে কর্ম্মফল ভোগ হয় কেন? কাজ ক'র্‌লে তার ফলভোগ যে নিশ্চয়—তবে যদি মার্কণ্ড ঋষির মত উৎকট তপস্যা ক'র্‌তে পারিস্—তাহা হইলে সব নষ্ট হয়।

ভক্ত। তবে কর্ম্মের ফল ভোগ ক'র্‌তেই হয়।

ক্ষেপা। নিশ্চয়! তুই ত' তুই, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ভোগ ক'র্‌তে হ'য়েছিল—তার চেয়ে আর কে আছে, নারায়ণ যার সখা; যে নারায়ণকে সর্ব্বদা ভাইয়ের মত সঙ্গে ক'রে বেড়াত সেই "অশ্বত্থামা হত" ব'লে নরক দর্শন ক'রেছিল। আর পাপপুণ্য যদি ভোগ ক'র্‌তে না হবে, তবে সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য থাক্‌বে কেন? একজন পণ্ডিত, একজন মূর্খ, একজন সবল, একজন দুর্ব্বল, একজন দাতা, একজন অদাতা, একজন ধনী, একজন গরীব, একজনের দুধে চিনি, একজন সমস্ত দিন খেটেও খেতে পায় না। কেন এরকম হয়?

ভক্ত। হাঁ প্রভু। তা ঠিক; এবার বুঝ্‌তে পেরেছি।

আজ ক্ষেপাকে সাদাপ্রাণে নানাপ্রকার কথা কহিতে দেখিয়া

আর একজন বলিল—আচ্ছা ঠাকুর! ত্রিসন্ধ্যা না ক'র্‌লে কি কোন পাপ হয়?

ক্ষেপা গম্ভীরভাবে বলিলেন—বামুনের ছেলে ত্রিসন্ধ্যা না কর্‌লে তেমন কিছু পাপ হয় না—তবে যে চণ্ডাল হয়।

ভক্ত। কেন ঠাকুর! ওতে কি কিছু আছে?

ক্ষেপা। দূর শালা, ওতেই ত' সব, ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দেয়—তবে তাকে ত্রিসন্ধ্যাপরায়ণ হ'তে হবে। ব্রাহ্মণের শরীর নিষ্পাপ এবং তাকে কোন রোগ ধ'র্‌তে পারে না কেন জানিস্—ঐ ত্রিসন্ধ্যার জন্যে! সকালে, দুপুরবেলা এবং রাত্রে যে কিছু পাপ করা যায়—সন্ধ্যার দ্বারা তা' ক্ষয় হ'য়ে যায়—পাপ ক্ষয় হ'লে দেহ রোগে ভোগে না, পাপেই ত' রোগ হয় গো! তো শালারা বুঝি তা' কেউ করিস্ না! যদি সন্ধ্যা-আহ্নিক নারায়ণ-পূজা না করিস্, তবে তোরা শালারা পতিত, আর আমার কাছে আসিস্‌নি।

ভক্ত। আচ্ছা বাবা! আপনি কি প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিক করেন?

ক্ষেপা জোর করিয়া বলিলেন—"অহরহঃ, তবে কি জানিস্ আমি তোদের মত ঠিক ঠিক মন্তোর আওড়াইতে পারি না; একেত নিরেট মুখ্যু, তারপর মা যেমন স্তনপান করিয়ে পুত্রের জীবন রক্ষা করে, "ওঁ যো বঃ শিব তমোরস স্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতিরিব মাতরঃ।" এখানে এলে আমি কেমন খেই হারিয়ে ফেলি! সব ভুলে গিয়ে মা, তুমি যা কর, ব'লে অচৈতন্য হ'য়ে

পড়ি—আর সন্ধ্যা করা যায় না। তারপর যখন তান্ত্রিক সন্ধ্যা ক'র্ত্তে বসি, "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া অমনি সন্ধ্যা ক'র্ব্বো, কিরে বাবা, আত্মতত্ত্বে মজিয়া হাতের জল হাতেই থাকে, আর মুখে উঠে না, আমি যে সন্ধ্যা করি না, তা' তোকে কে ব'ল্লে ?"

মহা বিচক্ষণ সাধুচরণ ধমক দিয়া বলিলেন—ওহে ! তুমি ত' বড় অর্ব্বাচীন দেখ্ছি, কার সঙ্গে কি কথা ক'চ্ছো।

ভক্তটী থতমত খাইয়া সরিয়া বসিলেন—ক্ষেপার ভাব দেখিয়া আর কোন কথা বলিলেন না। মনে মনে বলিলেন—কথাটা বলা ভাল হয় নাই; এরূপ তন্ময় পুরুষের আবার এত কর্ম্মকাণ্ডে কি হবে ?

সেদিন সন্ধ্যা হয় হয়, আর কোন কথা হইল না। ক্ষেপা বলিলেন—"বাবারা ! এই কটা দিন, তোদের গালাগালি-মন্দ দিব, তার জন্য কিছু মনে করিস্‌নি, আর যদি তোদের কিছু বল্‌বার থাকে, আর আমার শুন্‌বার থাকে, তবে আর একদিন আসিস্, আজ আর নয়।" এই বলিয়া পাগল ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের আসনাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তের মনে সন্দেহ হইল। প্রভু ! এই কটা দিন বলিলেন কেন ? তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে ? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কত কি কল্পনা করিতে লাগিলেন। ভক্ত ভাবিয়া পাইলেন না—ক্ষেপার এই কটা দিনের অর্থ কি ? বিচক্ষণ সাধুচরণ কহিলেন—"ওরে এ ক্ষেপা, ক্ষেপা নয় ! এই কটা দিন মানে—এই নশ্বর দেহ নিয়ে, এ

নশ্বর জগতে যে কটা দিন থাক্‌তে হয়। সাধুদের পক্ষে সংসারে থাকা, বা সংসার থেকে চলে যাওয়া বেশী একটা কঠিন সমস্যা নয়। কোটী জন্মের কথা ভাব্‌তে গেলে, এ জন্মের দিন কটা ত' নিমেষ মধ্যে গণ্য হয়। সাধুরা এ জগতে, কতবার কত রূপেই আবির্ভূত হ'চ্চেন, আবার নিমেষে অন্তর্দ্ধান ক'চ্চেন—আমরা তা বুঝ্‌তে পারি না।"

আবার কবে দেখা পাবো—ভাবিতে ভাবিতে উভয়ে বিষণ্ণ-বদনে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শরীর রক্ষা।

যোগসিদ্ধ না হইলে সদানন্দ উপভোগ করিতে পারা যায় না। বামাচরণকে কেহ কখন নিরানন্দ দেখে নাই। তাঁহার নিকট যখনই যাও, যখনই তাঁহার সহিত আলাপ কর, তখনই তাঁহাকে আনন্দময় দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিবে। তুমি যতই সংসার-তাপতপ্ত হও না কেন, ত্রিতাপে তাপিত হইয়া যতই তুমি ওষ্ঠাগত হও না কেন, ক্ষেপার নিকট একবার যাইয়া তাঁহার সঙ্গ করিলে, তাঁহার শ্রীমুখে সেই বালকের ন্যায় হাসিমাখা কথা শুনিলে এককালে তোমার সকল কষ্ট নষ্ট হইয়া, প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি সুখ উপলব্ধি করিবে—তুমি অন্ততঃ সেই সময় টুকুর জন্যও সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

একদিন একজন গুরুমহাশয় দারুণ কর্ণমূল রোগে আক্রান্ত হইয়া বামার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু-মহাশয়ের ইচ্ছা সেদিন মার বাটীতে থাকিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য হইবেন, কিন্তু তাহার রোগের যন্ত্রণা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাঁহার ভোগ ভক্ষণ করা ত' দূরের কথা, মুখ নাড়িবারও ক্ষমতা ছিল না, অথচ তিনি বহুদূর হইতে আসিয়াছেন

—উদরে ক্ষুধার আধিক্য জন্য প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন কিন্তু মুখে কিছুই তুলিতে ইচ্ছা হইতেছে না—যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইয়াছে।

লোকটী মন্দিরচত্বরে বসিয়া অসীম যন্ত্রণায় চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে, ইত্যবসরে বামাচরণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, লোকটী এই মহাপুরুষকে চিনিত না। অৰ্দ্ধ উলঙ্গ বিশাল দীর্ঘকায় পুরুষ নিকটে আসিলে লোকটী একটু ভীত হইয়া ভয়ে সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বামাচরণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হ্যাঁগা বাবু! আনন্দময়ীর বাটীতে এসে এত নিরানন্দ কেন, কেঁদে বুক ভাসাচ্ছ যে?

লোকটীর মায়ের প্রসাদ খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে—অথচ রোগ-যন্ত্রণায় খাইতে পারিতেছে না ইত্যাদি দুঃখ নিবেদন করিল। দয়াময় বামাচরণ বলিলেন—আহা বাপু। অমৃত খেলেই তুমি অমর হইবে—এত ভয় কেন, খাওনা—বলিয়া তাহার রোগগ্রস্ত কর্ণমূলে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন; হাত বুলাইয়া দিবামাত্রই যেমন অগ্নিতে জলসেক হইলে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, লোকটীর রোগ-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল। গুরুমহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া আহার করিতে করিতে বলিলেন—বাবা! আপনি কে বাবা, আপনি কি ভগবান্?

ক্ষেপা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভগবান্ ছুঁলে কি আর তুই শালা খাবার জন্য এত ছট্‌ফট্ কর্‌তিস্; আমি ভগবান্ নয়—তাহার চরণের একবিন্দু ধূলোর ধূলো। গুরুমহাশয়টীর

উপর বামার অত্যন্ত দয়া হইয়াছিল, তাই তার কি চাই—কি খেতে ভাল লাগে, প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—তাঁহাকে লোকটীকে খাওয়াইতে দেখিয়া পাণ্ডাগণ নিকটে আসিল এবং লোকটীর কি চাই না চাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এইবার তাঁহার খাতির দেখিয়া গুরুমহাশয় বুঝিতে পারিলেন—তারাপীঠে যে মহাপুরুষ বামাক্ষেপার কথা শুনিয়াছিলাম, তবে কি ইনিই তিনি? গুরুমহাশয় মহাপুরুষের সঙ্গ করিবার জন্য আর আহারে সময় নষ্ট না করিয়া আচমনান্তে পদধূলি লইলেন। ক্ষেপা বলিলেন—কেন গো বাপু! আবার এত নেটীপেটী কেন, কিছু মতলব আছে নাকি?

গুরুমহাশয়। প্রভু! মতলব আর কি; আমি বহুদূর থেকে এসেছি; আজ ত' যাইতে পারিব না?

গুরুমহাশয়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ক্ষেপা বলিলেন—থাক্‌বার জায়গা চাও বুঝি বাবা?

গুরুমহাশয় করযোড়ে বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ।

ক্ষেপা। তার জন্য আর এত কাকুতি মিনতি কেন, রাজ-রাজেশ্বরীর ভাণ্ডারে এসেছ—স্থানের অভাব কি; যেখানে ইচ্ছা থাক না, কেউ কোন কথা ব'ল্‌বে না।

গুরুমহাশয় কৃতজ্ঞতা জানাইলেন; তারপর রৌদ্রের উত্তাপ কিছু কম হইলে বামার সহিত কথোপকথন করিতে গেলেন। শরীর রোগগ্রস্ত ছিল বলিয়া এতক্ষণ গুরুমহাশয় কথা কহিতে পারেন নাই, তাহার উপর উপবাসেও দেহ অত্যন্ত কাহিল

হইয়াছিল, এক্ষণে যন্ত্রণা পরিমুক্ত হইয়া উদর পূরণে স্ফূর্ত্তির উদ্রেক হওয়ায় ধর্ম্মকর্ম্মের কথা মুখ হইতে বাহির হইল।

বামাচরণ গুরুমহাশয়কে নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন—কিরে তুই শালাও বুঝি কিছুক্ষণ জালাবি ?

গুরুমহাশয়। প্রভু! আপনি সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অতীত হইয়াছেন, আপনাকে জ্বালাতে পারে কে ?

ক্ষেপা। নে নে অত গৌরচন্দ্রিকা রাখ, কি বল্‌ছিস্ বল্ ? কোথা থাকিস্, কি করিস্ ?

গুরু। প্রভু! আমি বড়িসায় থাকি বাবা, পাঠশালা করি—ছোট ছোট ছেলে পড়াই !

ক্ষেপা। তবে গুরুমশাই !

গুরু। আজ্ঞা হাঁ, নামে বটে, কাজে নাই।

ক্ষেপা। কেন গো ? অজ্ঞান নাশ ক'রে—জ্ঞানদান যে মহাকাজ, বিদ্যাদান যে মহাধর্ম্ম। আমাদের দেশটা এই ক'রে যে এক সময় খুব বড় হ'য়েছিল।

গুরু। সে কি রকম প্রভু। বলুন না ?

ক্ষেপা। তা জানিস্ না—এই আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বিনা পয়সায় লোকের জ্ঞান দিতেন, চক্ষু ফুটিয়ে দিতেন—তার উপরে আবার তাদের খাওয়া-পরা দিতেন। একি একটা কম পুণ্য !

গুরু। আর এখন ত' আমরা পয়সা নিয়ে শিক্ষা দিই—এতে পুণ্য কি ?

ক্ষেপা। ঐ ত' দোষ হ'য়েছে, বিদ্যে বিক্রী করা হ'চ্ছে—নিঃস্বার্থভাবে না দিলে কি দানের ফল হয়—তার জন্য তোরাও "অস্থ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ," ছেলেগুলারও কেবল মুখস্থ বিদ্যা, কাজে কিছু হয় না।

গুরু। কেন ঠাকুর; কত ছেলে ত' বিদ্বান হ'য়ে টাকা রোজগার করে।

ক্ষেপা। তাইত' হয়—কেবল জড়শক্তিই ফুটে, চৈতন্যের বিকাশ হয় না—আমাদের দেশে চৈতন্যশক্তির বিকাশ খুব বেশী হ'য়েছিল ব'লেই ত' এ দেশ এত বড়, ধর্ম্মজগতে তাই ত' এরা এত উন্নতি ক'রেছিল, ভগবানের দেখাসাক্ষাৎ ক'র্‌তে পেরেছিল, তাঁহাকে সঙ্গের সাথী ক'র্‌তে পেরেছিল, আর এখন কি হ'চ্ছে কেবল পুঁথিগত বিদ্যে; আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হ'চ্ছে না? কেবল পুঁথি মুখস্থ করে; শীঘ্র শরীরের মাথাটী খাচ্ছে।

ভক্ত। প্রভু। প্রথমে শরীর একটু খারাপ হয় বটে, কিন্তু কত পয়সা রোজকার করে, পূর্ব্বে কি এমন ছিল?

ক্ষেপা। তো শালার বিদ্যে ত' খুব, শরীর খারাপ হ'লে বিদ্যে নিয়ে কি হবে, আর টাকাই তার কোন কাজে লাগ্‌বে, শরীর যে আগেরে শালা, স্বাস্থ্য না থাক্‌লে যে কিছু হবে না—স্বাস্থ্য যে সকল সুখের মূল। তুই কি ছেলেদের পদ্যপাঠ পড়াস্‌নি—তাহাতে ভক্ত কি প্রার্থনা ক'চ্ছে—"না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মন নাহি ধায়, ভোগ সুখে চিত রত নহে; ঈশ্বর এই বর দিন, সুস্থ থাকি চিরদিন, যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।" এ

প্রার্থনার চেয়ে কি আর প্রার্থনা আছে? ধনের অধিপতি রাজারও যে এ সুখ নেই?

ভক্ত। প্রভু! তবে সব ছেড়ে শরীর রক্ষা করা আগে দরকার?

ক্ষেপা। তুই শরীরী সর্ব্বস্বই তোর শরীর, তাকে রাখবিনি ত' কি নিরাকার ব্রহ্ম হ'য়ে থাক্‌বি? শাস্ত্র কি বলে জানিস্ না—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

ভক্ত। প্রভু সকলেই ত' বলে এ ত' পঞ্চভূতের দেহ, এটা কিছু নয়।

ক্ষেপা। যদি কিছু নয় ত' এতক্ষণ কেঁদে মর্‌ছিলি কেন? ওকথা যোগীর কথা, যারা সুখ দুঃখ সমান ভাবে—যোগবলে দেহ থেকে প্রাণশক্তি আলাদা ক'র্‌তে পারে, ও তাঁদের কথা; তো শালার কি সে শক্তি আছে, কেবল পাকা পাকা কথা কইতে পারিস্, কাজ কই?

ভক্ত। আচ্ছা প্রভু! তবে শরীরকে খুব যত্ন করা উচিত?

ক্ষেপা। খুব খুব, যত পারিস্। সাধনাই কর আর যাই কর, শরীর আগে।

ভক্ত। ঠাকুর শরীর কি সাধনা করে, মন ত' সাধনা করে?

ক্ষেপা। শরীর খারাপ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে যে মনও খারাপ হয় গো, আধার খারাপ হ'লে তার আধেয়ের যে দুশা! শরীর খারাপ হ'লে তুই তিলার্দ্ধ কি মন ঠিক্ রাখ্‌তে পারিস্?

ভক্ত। তবে প্রথমে এই যে সব ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম প্রভৃতি শিখ্তে হয়—সে কেবল শরীরের জন্য ?

ক্ষেপা। হাঁ! ও সকল শিখ্লে শরীর পাকা পোক্ত হবে, কষ্ট ক'ত্তে পার্‌বে, তবে ত' সাধনা—সেকি আর স্বাস্থ্য নষ্ট হ'লে হয়।

ভক্ত। তবে খাওয়া-দাওয়া খুব ভাল ক'রে চাই ?

ক্ষেপা। তা চাই বই কি ? তবে যা তা খাওয়া উচিত নয়, অনাচারী হওয়া ত' ঠিক নয়। শাস্ত্রকারেরা যে সব খাদ্য স্বাস্থ্যের উপযোগী বলেছেন, সেই সব খেতে হবে, নতুবা অনাচারী হ'লে রোগ ভোগ অনিবার্য্য !

ভক্ত। আচ্ছা! ঐ যে পাঁজীতে লেখে—অমুক তিথিতে অমুক খেতে নাই, ও সব ঠিক।

ক্ষেপা। তবে তারা কি সব মিথ্যে লিখেছে, ও সব বর্ণে বর্ণে সত্য।

ভক্ত। আচ্ছা ঠাকুর! আমি ত' নবমীর দিন লাউ খেয়ে দেখেছি, কই কোন অসুখ হয় নাই ত' ?

ক্ষেপা। কুপথ্য করিয়া সদ্যই কি অসুখ হয়—তবে তার ফল ভোগ যে হবে—সে বিষয়ে ভুল নাই।

ভক্ত। আচ্ছা! উপবাস করা কি ভাল ?

ক্ষেপা। দেখ বাবা! কলিতে নিরম্বু উপবাস নিষিদ্ধ—পূর্ব্বে যে লোকে ক'র্ত্তো, তখন সত্যযুগে লোকের মজ্জাগত পরমায়ু ছিল, একুশ হাত লম্বা মানুষ ছিল, লক্ষ বৎসর বাঁচ্তো

সকলেই চারপো পুণ্য সঞ্চয় ক'র্ত্তো। তারপর ত্রেতায় অস্থিগত প্রাণ হ'লো, চৌদ্দহাত মানুষ হ'লো, দশ হাজার বৎসর পরমায়ু হ'লো,—তিনপো ধর্ম্ম হ'লো, তারপর দ্বাপরে সহস্রবর্ষ পরমায়ু হ'লো, রুধিরগত প্রাণ, সাত হাত দেহ হ'লো, দ্বিপাদ ধর্ম্ম হ'লো। আর এখন যে একেবারে পড়ে গেছো বাবা, সাড়ে তিন হাত দেহ, সবে একশ কুড়ি বৎসর পরমায়ু—ধর্ম্ম নেই ব'ল্‌লেই হয়। আর খেতে একটু বেলা হ'লেই চক্ষে ধুতরা ফুল দেখিস্—প্রাণ তোর অন্নগত, উপবাস ক'র্ব্বি কি ক'রে—নিরম্বু উপবাস তো নইই—তবে খাওয়া দাওয়ার ওলট পালট করাটা ভাল।

ভক্ত। আপনার কথাগুলি অতি মধুর; শুন্‌লে প্রাণ জুড়ায়।

ক্ষেপা। এ সকল কথা কি আমার, আমি মুখ্যু মানুষ, কি এত কথাবার্ত্তা কইতে জানি—এ সব যে মায়ের গো।

ভক্ত। আচ্ছা প্রভু। আমি শূদ্র আমার কি কোন সন্ধ্যা-আহ্নিক নাই—তা হ'লে দুবেলা—একটু ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'র্ত্তে পারি?

ক্ষেপা। কেন থাক্‌বে না বাবা! তান্ত্রিক সন্ধ্যা ত' সকলেই ক'র্ত্তে পারে।

ভক্ত। প্রভু! তন্ত্রশাস্ত্র কি বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়?

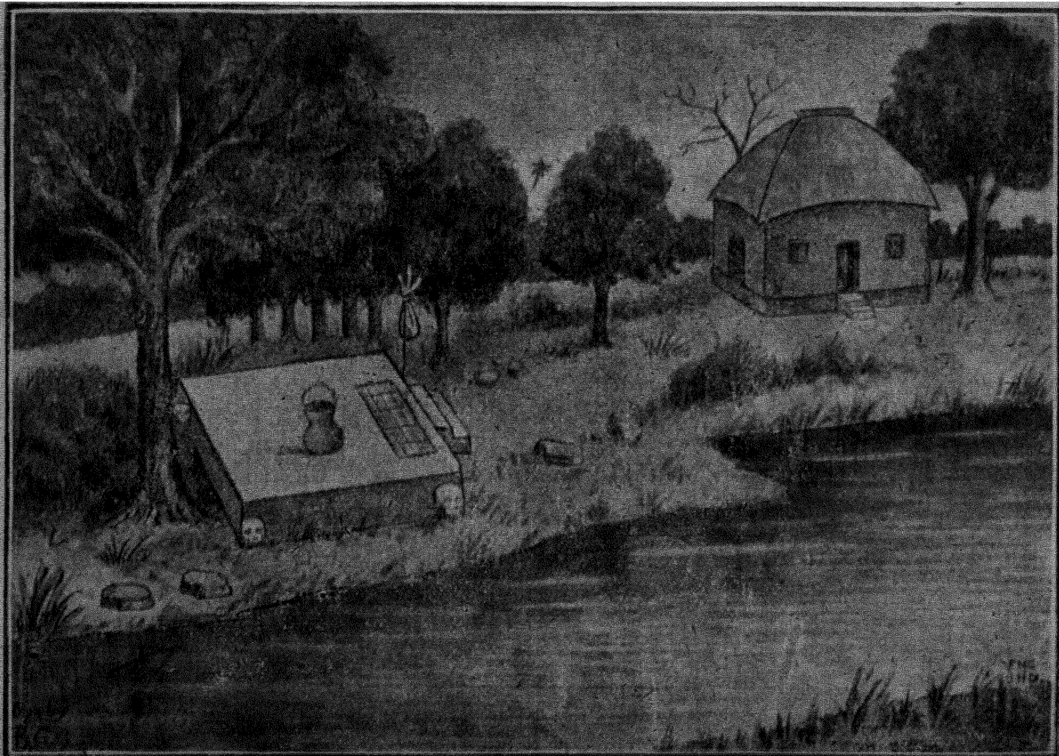
ক্ষেপা। ও আবার কি কথা! বেদের কর্ম্মকাণ্ডই ত' তন্ত্র। বেদের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ, জাত সংস্কার তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি সবই ত' তন্ত্র নামে অভিহিত। ভগবান্ মহাদেব ইহার বক্তা—ভগবতী শ্রোতা।

ভক্ত। আচ্ছা ঠাকুর! সিদ্ধিলাভটা কি? আপনি ইহা ভাল জানেন?

ক্ষেপা। এ আর কে না জানেগো। একেবারে সিদ্ধ হ'য়ে যাওয়া, ভাবে মজে যাওয়া, আপনার আস্তিত্ব লোপ করা, তুমি তিনি হয়ে যাওয়া, একেবারে মাতৃতত্ত্বে ডুবে আপনহারা হওয়া। তুই কখন খিচুড়ি রাঁধিস্‌নি কি? যখন দেখ্‌বি ডেলে মসলায় সব মিশে এক হ'য়ে গেছে, যখন ব্রহ্মসত্বা চালের কেবল একটু অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, আর কারো আকার নাই—তখন জান্‌বি, খিচুড়ি ঠিক সিদ্ধ হ'য়েছে, সকলে আত্মহারা হ'য়ে ব্রহ্ম-বস্তুতে মিলে-মিশে যাওয়ার নাম সিদ্ধ হওয়া জানিস্‌?

ভক্ত। মধুর! মধুর! প্রভু অতি মধুর! বলিয়া পদধূলি লইলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, ক্ষেপা আর বসিলেন না। বলিলেন—যারে যা, আর বকাস্‌নে, মাথা গরম হ'য়ে গেল, অত গভীর তত্ত্বে ডুবিস্‌নে, আস্তে আস্তে মায়ের নাম কর। সব গোল মিটে যাবে, বলিয়া ক্ষেপা চকিতের ন্যায় কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তটী সেদিনের মত বাসস্থান অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।



বামার সিদ্ধাসন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞসূত্র।

যে সকল ভক্ত সেদিন শিবরাত্রের সময় তারাপীঠে বামাচরণের কাছে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখে ধরা হইতে অন্তর্ধানের নির্ম্মমবাণী শুনিয়া হৃদয়ে আঘাত পাইয়া গিয়াছিলেন; আজ আষাঢ় মাসে রথের পূর্ব্ব দিনে তাহারা পুনরায় তারাপুরে আসিলেন; মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মায়ের শ্রীচরণ দর্শনান্তে মহাপুরুষ ক্ষেপার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আগ্রহান্বিত হইয়া তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, পাঁতি পাঁতি করিয়া শিমুল-তলা, ক্ষেপার সেই নরমুণ্ড নরকঙ্কালপূর্ণ অন্ধকারময় পবিত্র কুটীরখানি তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভক্তবৃন্দ তাঁহার সিদ্ধাসনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বামার সিদ্ধাসনের নিকট শাল্মলী বৃক্ষের নিকট দিয়া একটী স্থান যাহা জমী অপেক্ষা খুব নিম্ন, দেখিলে বোধ হয়, মাটীর নীচে কোন ঘর আছে—ইহা সেই ঘরে যাইবারই রাস্তা; ভক্তবৃন্দ উৎকণ্ঠিত চিত্তে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন—কিয়দ্দুর যাইয়া যাহা দেখিলেন—একটি নব নির্ম্মিত মাটীর বেদিকা প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহাতে একখানি শ্রীপাদপদ্ম ঠিক মন্দিরস্থিত দেবীমূর্ত্তির শ্রীচরণ

যেন এই মাত্র তাহাতে স্পর্শ হইয়াছে; এখনও তাহা কোন প্রকার মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। তদুপরি সন্ত প্রস্ফুটিত রক্ত-জবাদল শোভা পাইতেছে। তাঁহারা যখন তথায় গিয়াছিলেন, তখন বেলা নয়টা, কিন্তু দেখিয়া বোধ হইল—এ পূজা হইয়াছে, গত রজনীর ঊষা সময়ে,—কারণ ফুলগুলি তখনও সজীব রহিয়াছে, রৌদ্র-তাপে কিছুমাত্র শুষ্ক হয় নাই। ভক্তবৃন্দ দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না। তথায় ভক্তবৎসলা জননী ভক্ত-প্রবর বামার পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়া তাহারা ভাবমগ্ন-হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। রজনীযোগে বামা মন্দিরের দরজা খোলা পায় নাই, অথচ ভবারাধ্য-চরণে অঞ্জলি দিবার বাসনা হইয়াছে—তাই ভক্তের এই আবাহন।

প্রাতঃকালে মায়ের অন্তর্ধান দর্শনে ক্ষেপা বিষম ক্ষেপিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—অন্যমনে হয় ত' কোথায় গিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে—এ পাদপদ্ম মুছিয়া ফেলিবার সময় পায় নাই, অথবা ভুলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহার সকল সময় ত' সকল কাজ ঠিক হয় না—নতুবা এ গোপনীয় বিষয় কি এরূপ ভাবে ফেলিয়া যাইতে পারেন? এই সকল চিন্তা করিয়া তাহারা সাধক সম্বন্ধে নানা প্রকার উচ্চ মহান্ ভাব, তাঁহার সাধকত্বের নানা প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় পাগলা সেই কালু ভুলু প্রভৃতি কুকুর পরিবেষ্টিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় ভাব-বিভোরে নাচিতে নাচিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তগণকে

দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—তো শালারা এখানেরও সন্ধান পাইয়াছিলি, তোরা যে আমাকে বিষম জ্বালাতন করলি দেখ্‌চি? এই বলিয়া সেই-মৃৎ-বেদিকার উপর তারানামে বিষম রোল তুলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেই বিষম চীৎকারে তারাদাস বামার সেই বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া আগুণ ছুটিতে লাগিল, তারপর একেবারে সংজ্ঞা লোপ, আর কোন বাহ্য চৈতন্য নাই। ভক্ত সকলে সেই পরম পবিত্র দেহ বেষ্টন করিয়া সেবা করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন ঃ—

ও মোর পামর মন এখন বলনা কালী।
ওরে কাল এলো, কাল গেলো, কেন কালী পদে না বিকালী?
ক'রো না রে মন আজি কালি,
ওরে আজি কালি ক'রে, কি কাল কাটাবি চিরকালি।

মাতৃনাম শ্রবণকূহরে প্রবেশ করিলে পর তারাদাসের নয়ন-তারা ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইতে লাগিল, আবার বাহ্যিক চৈতন্য আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল—সদানন্দময় প্রেমানন্দে পাগল বামাচরণ তারপর হাসিতে হাসিতে ঠিক বালকের মত আপনার মনে চুপে চুপে কত কি বলিতে লাগিলেন—তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল না। প্রধান ভক্ত সাধুচরণ তখন করযোড়ে বলিলেন—বাবা? সংসার বন্ধনে এতদিন বড়ই বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলাম—তাই চরণ দর্শন ক'র্ত্তে আস্‌তে পারি নাই—এখন কেমন আছেন?

বামাচরণ অধরে মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া মুদিত চক্ষু কিঞ্চিৎ

উন্মীলিত করত বলিলেন—কেন বাবা ও কথা ব'ল্‌ছো, যে কখন কষ্টে থাকে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লেই ব'ল্‌তে হয়—বাবা কেমন আছ, তাহার মানে সুখে আছ কি দুঃখে আছ? আমার ত' বাবা তা' নেই, মা যে আমার আনন্দময়ী, আনন্দ ছাড়া ত' নিরানন্দে কখন থাকি না, তবে আর কেমন থাকাথাকি কি? যা কেউ থাক্‌তে পারে না—সেইরূপ আছি, খুব ভাল আছি। মায়ের ছেলের আবার খারাপ কি? শারীরিক, মানসিক, বাচনিক সব ভাল। মঙ্গলময়ীর কৃপায় খুব কুশল, তোদের মা কেমন রেখেছেন?

সাধু। প্রভু! প্রাণে প্রাণে ভাল বটে, তবে সংসারের সকল সুখ কোথায়?

ক্ষেপা। সে কিরে, থাক্‌তে জান্‌লে—মাকে হৃদয়-পদ্মে রেখে সংসার ক'র্ত্তে পার্‌লে অসুখ, অকুশল কি আর তিষ্ঠিতে পারে?

সাধু। বাবা! তা সদা সর্ব্বদা পারি কই? সংসার-ভাব যে আমাদের হাড়ে হাড়ে গাঁথা হ'য়ে গেছে।

ক্ষেপা। সে ভাবওত' চাই গো—সে ভাবও যে মায়ের গো; বেটীও যে সংসারে ঝালাপালা হ'য়ে সময়ে সময়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। যা বলো, যা করো সবই যে মায়ের একচেটেরে বাবা।

সাধু। ঠাকুর! সংসারে যেরূপ অধর্ম্মের স্রোত বইছে—তাতে ত' আর মন স্থির হয় না; এ সকল কাণ্ড ত' আর

দেখ্‌তে পারা যায় না। যজমান যজিয়ে সংসার এক রকম চল্‌তো, এখন আমাদের পাড়ায় অনেক কায়স্থ পৈতে নিচ্ছে; তারা আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'র্ত্তে চায় না। অপর একজন তাহার কথার উপর কথা তুলিয়া আগ্রহ সহকারে বলিল—শুধু কায়স্থ কেন ভাই! কৈবর্ত্ত যুগী প্রভৃতি সকলেই পৈতে নিচ্ছে, আর কেহ ত' বাকী নাই। প্রভু! এ হ'লো কি, আমাদের ত' অন্ন মেলা দায় হ'য়েছে?

ক্ষেপা। কেন গো, এত ভালই হ'চ্ছে, ছোট সব বড় হবার চেষ্টা ক'র্চ্ছে, তারা কি চিরকালই ছোট থাক্‌বে?

সাধু। প্রভু! তারা যে আমাদের ছোট ক'রে দিচ্ছে, আমাদের আর মানে না।

ক্ষেপা। তা কি হয়—বড়কে কি ছোট ক'রে দিতে পারে—এ যে মায়ের বড় করা। আমরা যে বড়, তা' ত' তাদের পৈতে নেওয়াতেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে। গলায় দড়ি গুলো বড় ব'লেই ত' তারা বড় হবার জন্যে গলায় দড়ি দিচ্ছে, বামুন বড় ব'লেই ত' তারা বামুন হ'তে চায়? তোরা না হয় এইবার ঐ দড়ি গুলো ফেলে দে, চেনা বামুনের ত' আর পৈতার দরকার নেই। ওদের বামুন ব'লে চিন্‌তে এখন ঢের দেরী—ওরা কিছু দিন দড়ি পরে বামুনত্ব ফলাক, তোরা এখন ফেলে দিয়ে ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দে।

সাধু। ঠাকুর! এ কি ব'ল্‌ছেন, পৈতা ফেলে দেবো কি?

ক্ষেপা। হা গো, সাধক যখন সাধনার চরম সীমায় উঠে,

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হয়, তখন আর তার বাহ্য সূত্র ধারণ করবার দরকার হয় না—খুলিয়া পড়িয়া যায়—ব্রাহ্মণের এ যজ্ঞসূত্রটা শুধু ত' বাহারের জন্য নয়, এখন সেইরূপ হ'য়েছে ব'লেই ত' যে সে নিতে চায়—আর বারণ করবারও ত' কেউ নাই—রাজশাসন ত' তত আঁটা আঁটী নয়।

ভক্ত। যজ্ঞসূত্র তবে সকলেই নেবে?

ক্ষেপা। ওগো পৈতেটা ত' শুধু জাতিগত নয়—ও যে কর্ম্মগত, ব্রহ্মযজ্ঞে পূর্ণজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির যজ্ঞসূত্র ধারণ সঙ্গত। প্রথমে উহা ধারণে আসক্তি আসিলে ক্রমে তাহার অনুরূপ শক্তিলাভেরও চেষ্টা হইত, ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্র ধারণের পর ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া আপন কৃতিত্ব বজায় রাখিত, কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিত, তাই তখন সকলে তাহাদের সেই প্রাণান্তকর কঠিন অথচ ব্রহ্মভাবময় কর্ম্মাবলী দেখে আর এগুতে না পেরে মাথা হেঁট ক'রে পায়ে পড়তো, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিতে মাথার মণি ক'রে রাখ্‌তে পথ পেতো না। প্রথমে বাহ্য সূত্র রাখ্‌তো তারপর ফেলেও দিত, তাতে কি তাদের কেউ অব্রাহ্মণ ব'লে অমান্য ক'র্ত্তে পারতো, তাদের দেখে মানুষ ত' কোন্ ছার দেবতারাও যে ভয় পেতো? ব্রাহ্মণ হওয়া শুধু পৈতেয় হয় না বাবা, কই শুকদেব গোস্বামীর কটা পৈতা ছিল? ব্রহ্মজ্ঞানময় সাধকগণ এখনও সাধনার শেষে যজ্ঞসূত্র পুড়িয়ে ফেলে। কই তাদের ব্রাহ্মণত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে না? বাবা! ওকি কেড়ে নেবার জিনিষ! যে বেটারা নিচ্চে নিক্ না—গলার

সূতা গলায়ই থাক্‌বে। তোরা তোদের কাজ ক'রে—ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখ্‌না—তাদের চেয়ে উচু হ'তে চেষ্টা কর না। একটি গল্প আছে শুনিস্‌নি কি ?

ভক্ত। কি ঠাকুর! দয়া ক'রে বলুন না।

ক্ষেপা বলিতে আরম্ভ করিলেন—পূর্ব্বকালে একগ্রামে লোকেরা গঙ্গাদেবীকে খুব মান্‌তো ছেলেপিলের পীড়া হ'লে, কোন প্রকার বিপদাপদ ঘটলে, দেবীর পূজা দিতো, কিছুদিন পরে একজন ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে খুব পাকা—আশ্রম ধর্ম্মের মত সব কাজ ঠিক ক'র্ত্তে লাগলো, সে জান্‌তো এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে—ব্রাহ্মণ জাতটা সকলের চেয়ে বড়, এই বড়ত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য আশ্রমোচিত ধর্ম্মকর্ম্ম খুব নিষ্ঠাভাবে সে ক'র্ত্তো, এইজন্য তার ব্রহ্মতেজও খুব বেড়ে ছিল, তাহাকে দেখে সকলেই ভয় ক'র্ত্তো, ছেলে-পিলেদের বা নিজেদের পীড়া হ'লে তারই পাদকজল খেতো, আর আরাম হ'তো। এতে তার ছোট বড় জ্ঞান ছিল না, যে এসে পাদকজল চাইতো, তাকেই দিত, বয়সে বড় ছোট বিচার ক'র্ত্তো না।

এ দিকে গঙ্গাদেবীর পসার কম্‌তে লাগলো, আর বড় একটা কেউ তাঁর কাছে যেতো না, তাঁর জলও পান ক'র্ত্তো না। দেখে শুনে গঙ্গাদেবীর বড় গোঁসা হ'লো, রাগে গর্‌ গর্‌ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে একদিন ব্রাহ্মণকে জব্দ করবার জন্য এসে উপস্থিত, ব্রাহ্মণের হুকুম ছিল—আশ্রমে যে আস্‌বে, সেই নম্রভাব হ'য়ে আস্‌বে। ভগবতী গঙ্গা রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা, অবজ্ঞা ভাবে আশ্রমে

প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন, ব্রাহ্মণ চিররীতি অনুসারে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণের বিষম অহমিকা দেখিয়া দেবী আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না—সরোষে বলিলেন—তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলে যে ?

ব্রাহ্মণ। তুমি বিনীতভাবে আসিয়া নমস্কার করিলে, আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করিবার ক্ষমতা আমার আছে—করিব না ?

গঙ্গা। আমি কে তা তুমি জান ?

ব্রাহ্মণ। জানিবার আবশ্যক কি ?

গঙ্গা। আমি গঙ্গা ?

ব্রাহ্মণ। বেশ ভাল।

গঙ্গা। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার ক্ষমতা তোমার আছে ?

ব্রাহ্মণ। কেন থাকিবে না, খুব আছে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দেবীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি পূর্ব্ব হইতেই মোহ প্রাপ্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে ক্রোধানলে জ্বলিতে জ্বলিতে সেখান হইতে আসিবার সময় বলিয়া অসিলেন—আগে ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া আসি—তারপর তোমায় সমুচিত শাস্তি দিব। এই বলিয়া দেবী রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অধরোষ্ঠ দংশন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য জানিবার জন্য গমন করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন—দেবী তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন—মা! দেখিতেছি

তোমার মূর্ত্তি বড়ই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েছো, কেন মা! এত পরিশ্রম ক'রে—মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া একেবারে ব্রহ্মলোকে এলে, কোন কাজ আছে কি?

গঙ্গা বলিলেন—পিতামহ! এক ব্রাহ্মণের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য জানিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি—আমাকে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া পরিতৃপ্ত করুন। রাগে কি না হয়—গঙ্গার মোহপ্রাপ্তি বিষয় বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন—মা! ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রকারে বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই; তুমি কৈলাসে গমন কর।

দেবী আর তথায় বিলম্ব না করিয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্কর একান্তমনে কৈলাসে উপবিষ্ট, এমন সময় গঙ্গা তথায় গমন করিয়া প্রণাম করিলেন। দেবীর তখনকার ভয়ানক রোষ-মূর্ত্তি দেখিয়া, সদাশিব পত্নীকে পরিহাস ছলে বলিলেন—কিগো জলময়ী! শীতলতার আধার হইয়া আজ অগ্নিময়ী মূর্ত্তিতে যেন চারিদিক দগ্ধ করিয়া আসিতেছ—ব্যাপার কি?

দেবী বলিলেন—প্রভু! এখন পরিহাস রাখুন, আমি একজন ব্রাহ্মণের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য জানিবার জন্য আসিয়াছি। আমাকে দয়া—ক'রে তাহা বুঝাইয়া দিন। সদাশিব পত্নীর মোহ-প্রাপ্তির বিষয় বুঝিয়া মনে মনে কপট হাসি হাসিয়া বলিলেন—গঙ্গে! ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য অতি গুরুতর বিষয়, এত সাধন-ভজন করিয়াও ঐ গুরুতর বিষয় আমার এখন ভালরূপ

বোধগম্য হয় নাই। অতএব তুমি বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া ভগবানের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ফল হইবে। গঙ্গা আর দাঁড়াইলেন না; তিনি অতীব বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, মনে করিলেন একি এ?—ব্রহ্মা জানেন না, আমার প্রাণের প্রাণ যোগীশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব জানেন না, তবে কি ব্রাহ্মণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ? মনে মনে এই তোলা-পাড়া ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে দেবী বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপস্থিত। তথায় সকলেই একমূর্ত্তি সাযুজ্যপ্রাপ্ত, বিষ্ণু হইতে দ্বারি পর্য্যন্ত সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবসন পরা, নবীন মেঘের ন্যায় বর্ণ দেবী ক্রমশঃ অগ্রসর হইলেন কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বিষ্ণুকে চিনিতে না পারিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভগবান্ বিষ্ণুর সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন, ত্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ্ণু দেবীর মোহ প্রাপ্তি বিষয় বুঝিতে পারিয়া নিজেই নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—এস মা এস! বলিয়া সাদর সম্ভাষণ ক'রে সিংহাসনে বসাইলেন এবং বলিলেন—কেন মা! এত পরিশ্রান্ত হ'য়ে মর্ত্ত্যধাম হইতে একেবারে বৈকুণ্ঠে আসিয়াছ? কোন আবশ্যক আছে কি?

গঙ্গা বলিলেন—প্রভু! আজ একটী বিষম সমস্যায় পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, সে বিষম সমস্যার বিষয় আমাকে অবগত করাইয়া চিন্তা দূর করুন।

ভগবান্। কি এমন সমস্যা মা, যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও বুঝিতে পার নাই; যাহা হউক, বল তোমার অভিপ্রায় কি?

গঙ্গা। ঠাকুর! আমাকে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিন, কোথাও ইহার সদুত্তর পাই নাই—আমি বড় বিপন্ন হইয়াছি।

ভগবান্। মা! তুমি অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছ—তাই বুঝিতে পার নাই—বুঝিবার চেষ্টাও বোধ হয় কর নাই; আর এই বিষ্ণুলোকে আসিয়াও তোমার মোহ ঘুচে নাই।

গঙ্গা। না প্রভু! আপনি বলুন।

ভগবান্। মা! দেখিতেছ বৈকুণ্ঠের সকলেই এক অবয়ব ও এক পরিচ্ছদ সম্পন্ন—কাহারও পার্থক্য নাই। তবে একটী দ্রব্য আমার আছে যাহা অন্যের নাই এবং সেইজন্য আমি ত্রিলোকপূজ্য, ত্রিলোকের রাজা! এই বলিয়া গাত্রবসন উন্মোচন করিয়া ত্রিলোকপাবন জগন্নাথ নিজ বক্ষঃস্থলের সেই ভৃগুপদ চিহ্নটী দেখাইয়া বলিলেন গঙ্গে! এই চিহ্নটী আর কাহারও নাই—আর এইজন্যই আমি সকলের শ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য আর বেশী কিছু তোমাকে বলিতে হইবে কি? তুমি যার পদে উদ্ভূত—তিনি সেই পদ বক্ষে ধারণ করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মণ যে সকলের বরেণ্য তাহাতে ত্রিলোকতারিণীর এ ভ্রম বড়ই দুঃখের বিষয়! গঙ্গার মোহ ঘুচিল—হৃদয় ব্রহ্মভাবে বিভোর করিয়া, তখনই সেই আশ্রমে আসিয়া মা ভীষ্মজননী ব্রাহ্মণকে কোলে করিয়া ধন্য হইলেন।

ব্রাহ্মণ দেবীর পদধূলি শিরস্পর্শ করিয়া বলিলেন—মা! যাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছ; শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া যাহাদের

মান বাড়াইয়াছ, তাহাকে আবার মোহবশে, অধঃপতনের নরকে ডুবাও কেন? মাতৃশক্তির প্রাবল্য না থাকিলে কি ছেলে এত বড় হইতে পারে—এ যে তোমারই শক্তি মা! দেবী প্রাণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এখন বুঝ্লি ব্রাহ্মণের শক্তি কতদূর এবং খালি যজ্ঞসূত্র ধরে বড়াই ক'র্লেই হয় না—কর্ম্ম ক'র্তে হয়। আশ্রমোচিত কার্য্য খুব ভাল ক'রে কর, ব্রহ্মশক্তি জাগাতে চেস্টা কর, ক্রমে ক্রমে আপনার কাজ সন্ধ্যাহ্নিক নিত্যপূজায় লেগে থাক না, মনোযোগের সহিত কি অমনোযোগের সহিত হ'চ্ছে—তা এখন তত দেখবার দরকার নাই—কাজ করে যা। এ কাজের এমন মোহিনীশক্তি, এমন আকর্ষণ যে অবহেলায় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেও একদিন সব এমন ঠিক হ'য়ে যাবে যে তোর জন্ম সার্থক হ'য়ে যাবে—তখন সহজেই বল্‌তে সক্ষম হবি—"চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্" তখন কি আর তোর রাগ দ্বেষ থাক্‌বে—না কেউ তোর প্রতিহিংসা-দ্বেষ ক'র্ত্তে সাহস ক'র্‌বে—তখন সেই শ্রেষ্ঠত্ব—সেই "ব্রহ্মজানিত ব্রাহ্মণ" সকলেই তোর পায়ের ধূলো চেটে খাবার জন্য লালায়িত হবে—পাবে না।

ভক্ত। বাবা খুব সুন্দর; এমন কথা না শুন্‌লে কি প্রাণ জুড়ায়। এখন বুঝ্‌লুম ওটা কেবল জাতিগত ক'ল্লে হবে না—ধর্ম্মগত, কর্ম্মগত ক'র্ত্তে হবে। আচ্ছা বাবা! তবে বামুনের ছেলে কি বামুন নয়?

ক্ষেপা কৃত্রিম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—না, মামুনের ছেলে

চাঁড়াল ; এতক্ষণ ধ'রে যে বক্‌লুম—তার কি বুঝলি তবে ; প্রথমে জাতিগত ক'র্ত্তে হবে, তারপর আশক্তির বশে, প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মায়ের শরণাপন্ন হ'য়ে কাজ ক'র্ত্তে হবে, কেবল পৈতের বড়াই ক'র্বো আর কাজ ক'র্বো না, তা হ'লে কাঁধের সূতা কাঁধেই থাক্‌বে, সকলে সাধ ক'রে ফেসীয়ানের জন্য পরতে চেষ্টা ক'র্বে ; সকলকে ছোট ক'র্ত্তে হ'লে, কাজ ক'র্ত্তে হবে। এ সকল তোদের পুরুষানুক্রমে সাধা বিদ্যে—একটু চেষ্টা ক'র্‌লেই যে চরমে উঠতে পারিস্, তখন কি আর কোন বেটা তোদের অধিকার কেড়ে নিতে এগুতে পার্‌বে—না তার জন্য চেষ্টা ক'র্‌বে। তোর বংশাবলীর কাজ অস্থিমজ্জাগত রয়েছে—কেবল চেষ্টাহীন হ'য়ে পাঁশ ঢাকা দিয়ে ফেলেছিস্, তাই প্রকাশ পায় না। একটু পাঁশ সরিয়ে তেজ দেখ্ না। অন্য বেটারা নূতন ব্রতী, তোদের নষ্ট ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা ক'চ্ছে, তাদের আশা কি মা শীঘ্র ক'রে সফল ক'র্বে ?

ভক্ত। প্রভু! তবে আপনি আমাদের দীক্ষা দিন না, কাজ করবার পথ দেখান না ?

ক্ষেপা। দুর শালারা! আমি কাকেও দীক্ষা দিয়েছি, না তা জানি, তোদের কুলগুরুর নিকট থেকে নিগে যা, কুলগুরু ছেড়ে যার তার কাছে মন্ত্র নিলে কিছুই হয় না—একথা ত' তোদের কতবার ব'লেছি।

ভক্ত। যার কুলগুরু নাই—তার উপায় কি ?

ক্ষেপা। প্রাণে যার অনুরাগ আসে, গুরুমন্ত্র নেবো ব'লে

অত্যন্ত আগ্রহ হয়—মা তার বাসনা পূর্ণ করেন। তাঁকে সমস্ত বিষয় জানাবি—তোর সমস্ত অভাব অভিযোগ প্রাণ খুলে ঠিক ছেলের মত ব'ল্‌বি—তাহ'লে আর কিছু ভাবতে হবে না, যখন যা দরকার তাঁর কৃপায় সমস্ত জুটে যাবে। তিনি ত' সদাসর্ব্বদা দুইটী হাতে বরাভয় নিয়ে তোদের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন—কখন কি চাইবি ব'লেই ত' তাঁর দুইটী হাত বাড়ান রয়েছে—সে নির্ভরতা সে বিশ্বাস কোথা—কেবল ফাঁকা কথা শুনে দুদণ্ডের তরে শ্মশান বৈরাগ্য হ'লে ত' চল্‌বে না; রাবণের চিতার মত বাসনার বাতি প্রাণে জ্বেলে রাখ্‌তে হবে।

ভক্ত। প্রভু! বাসনা ত্যাগ না ক'র্‌লে যে হয় না—সকলে বলে।

ক্ষেপা। সে কথার কথা বলে—প্রাণের নয়, বাসনা কি সহজে ত্যাগ হয়। লোকের কাছে সকামবৃত্তি চরিতার্থ ক'র্ত্তে গেলে ত' হবেই না—চিরকাল সমান থাক্‌বে; কামনা বাসনা যতক্ষণ থাকে মায়ের কাছে প্রকাশ কর—তাহ'লে এমন পাবি যে, তাতেই তৃপ্তি, তিনি মনে ক'র্‌লে, ও আগুন কতক্ষণ থাকে? তিনি দরকার হ'লে, সব টেনে নেবেন—নতুবা মানুষ ইচ্ছা ক'রে এ সব ছাড়্‌তে পারে না; অর্জ্জুনই পারেনি, তা তুমি আমি কোন্ ছার? ভগবান্ যখন বিশ্বরূপ দেখিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী ক'র্‌লেন—তখন সে ব'লতে পেয়েছিল—ঠাকুর! ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই—অধর্ম্মে আমার নিবৃত্তি নাই—ত্বমেকপতি দেব! আমাকে যেরূপ করাবে আমি সেইরূপ ক'র্ব্বো। অর্জ্জুন

তখন তন্ময়—নর-নারায়ণে অভেদ আত্মা। সে সব যোগের, বহু জ্ঞানের কথায় তোদের কাজ নাই—যা ক'রছিস্ কর, আশ্রমের উচিত ধর্ম্মকর্ম্ম ক'র্‌বার জন্য প্রার্থনা কর—একেবারে অত বড় বড় কথা ক'স্‌নি।

ক্ষেপা নীরব হইলেন—মন কি ভাবে বিভোর হইয়া গেল। স্তিমিত নেত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন—মা! ক্ষেপা ছেলে, তোর কাছে না চাইলে—আর কোথা পাবে, কে দেবে, যার মা এত বড় ধনীর বেটী তার ছেলের অভাব আর কার কাছে জানায় মা? সে মায়ের আঁচল ধ'রে ত্রিবর্গ মুঠোর ভিতর নিতে চায়। বেটী তুই দিবি-নি বলিয়া দন্ত কিড়ি-মিড়ি করিতে করিতে ক্ষেপা অচৈতন্য হইলেন। দেহ নিস্পন্দ, নাসিকার আর শ্বাস-প্রশ্বাস বহে না। গভীর সমাধি মগ্ন। যখন চৈতন্য হইল—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সায়ংকৃত্যের জন্য সকলে তাঁহার চরণধূলি লইয়া বিদায় হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বামাচরণের ভাব বড় উদার হইয়াছিল, সকলকেই মধুর সম্ভাষণ ক'র্ত্তেন—পদে পদে ক্রুটী স্বীকার ক'র্ত্তেন, তাঁহার এরূপ নম্রতা পূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। তাই সকলে তাঁহার অবস্থিতিবিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; একজন না একজন ভক্ত বা পাণ্ডা অনবরত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য কাছে কাছে হাজির থাকিত—ইহাতে ক্ষেপা কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইতেন, বলিতেন তো শালারা যে এখন বড় নেটপেটা হ'য়েছিস্ দেখছি, পাগলের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করা কি ভাল—তোদের কি মাগ-ছেলে, বাড়ী ঘর নেই—যা-না নিজের কাজ ক'রগে যা—পাষাণের নিকট এত প্রেম কেন? মনে করেছিস্ কি সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার আট্‌কাতে পারবি? যেদিন এই সব কথা হচ্ছিল, সেদিন একজন খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত ক্ষেপার কাছে কাছেই ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখে এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া ভক্তটীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ব'ল্‌লেন বাবা! এ কি ব'ল্‌ছেন তা হ'লে আমাদের উপায় কি?

ক্ষেপা। বাবা! উপায় মায়ের পা'য়—যা ক'র্‌বার তিনি

করেন। একটা উপায় তিনি ক'র্‌বেনই। আমাকে আর তিনি রাখ্‌বেন না—এ কথা আজ দু তিন দিন হ'লো হ'য়ে গেছে। তুই যেন এ কথা কারু কাছে প্রকাশ করিস্‌নি, তোকে খুব ভালবাসি ব'লেই ব'ল্লুম! ভক্তটী কাহার কাছে কিছু প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি সদাসর্ব্বদা বামার কাছে কাছেই রহিলেন।

একদিন ক্ষেপা নাট মন্দিরে ভাস্বর নয়নে বসিয়া মায়ের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া আছেন—চক্ষের পলক নাই। এমন সময়ে দুইজন ভক্ত তথায় আসিয়া ক্ষেপাকে প্রণাম করিল। ক্ষেপার দৃষ্টি এখন মাতৃ-অঙ্গে লীন হইয়াছে, চক্ষে দর-বিগলিত ধারা বহিতেছে, —অন্য সময় হইলে হয়ত' ক্ষেপা "এস বাবা এস" বলিয়াও সাদর সম্ভাষণ করিতেন। কারণ এ ভক্তদ্বয় তাঁর খুব প্রিয়পাত্র—খুব ভাল গায়ক। ক্ষেপা ইহাদের গান্‌ শুনিলে আরও ক্ষেপিয়া যান—প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচার ধূম পড়িয়া যায়। কিন্তু আজ তাহার কিছুই হইল না। গায়কদ্বয় ক্ষেপার ভাব দেখিয়া আর কোন কথা না কহিয়া সরিয়া বসিলেন। তাঁর তন্ময়ত্ব দেখিয়া তাহাদেরও প্রাণ গলিয়া গেল। তাঁহার উপদেশানুসারে মনে প্রাণে হউক বা নাই হউক—জপে বসিলেন। মন একটু সরস হইলে—মুখ ফুটিয়া বাহির হইল—

(আমার) এত কাছে কাছে, হৃদয়েরি মাঝে,
রয়েছ তুমি হে হরি।
(কিন্তু) আমি ভাবি মনে কত দূরে তুমি
রয়েছ আমায় পাশরি॥

(যেমন) ছায়াবাজী-করে, কত খেলা করে,
আড়ালে লুকায়ে থেকে।
(তেমনি) আমাদের লয়ে, লীলামত্ত হ'য়ে,
রেখেছ আপনা ঢেকে॥
(যেমন) কি ফুল ফুটেছে, কোন বনমাঝে,
মত্ত হ'য়ে অলি ধায়।
(তেমনি) তোমার কারণে, তব অন্বেষণে,
(আমার) প্রাণ কোথা যেতে চায়॥

ক্ষেপা তখন সমাধিপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন—প্রাণ ষট্‌পদ উড়ু উড়ু করিয়া যেন সেই প্রেমমধুভরা অমৃতময় মাতৃচরণ-পদ্মে বসিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল—এমন সময় কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিল—"(তেমনি) তোমারি কারণে, তব অন্বেষণে, (আমার) প্রাণ কোথা যেতে চায়" প্রাণ ত' যেতে চাহিতেছে—আর যে রাখ্‌তে পারা যায় না—বহুদিন মেশামিশী হয় নাই—তাই আজ একেবারে ভাবতরঙ্গে তলাইয়া পড়িলেন। ক্ষেপা গান বড় ভালবাসেন বলিয়া গায়কদ্বয় এইভাবে তাঁহাকে চৈতন্য করিবার জন্য গাহিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হইল না বরং আজিকার সমাধি অতীব গভীর—বহুক্ষণ স্থায়ী হইল। যখন সমাধি ভাঙ্গিল—তখন বেলা হইয়াছে—ভোগের সময় হইয়াছে। ক্ষেপা ভক্তগণ সহ আপনার আসনে গেলেন। তিনি ভোগ নামমাত্র উপভোগ করিলে পর ভক্তগণ সেই অমৃতোপম প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য হইল।

আহারের পর বিশ্রাম—কিয়ৎক্ষণ সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষেপা বলিলেন—বাবা! আজ কেবল আনন্দ কর—কেবল ভগবানের নাম কর, আজ আর অন্য কথা তুলে মাথা গরম ক'রে কাজ নাই—আমার ওসব আদৌ ভাল লাগে না। প্রথম শিষ্যটী বলিলেন—বাবা! আপনার সব জানা হ'য়ে গেছে, তাই আর ভাল লাগে না। আমাদের যে কিছু জানা নেই, সকল বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়—তাই না জেনে নিলে থাক্‌তে পারি না।

ক্ষেপা। বাবা! নিজে একটু ভাল ক'রে খাট্ না, একটু ধ্যানধারণা ভাল ক'রে কর্ না—তা হ'লেই ক্রমে আপনি সব বুঝ্‌তে পার্‌বি—আর সন্দেহ হবে না।

ভক্ত। বাবা! খাট্‌লেই যদি হ'তো, তা'হলে ত' কত লোক খেটে খেটে হাড় কালি ক'রে ফেল্‌লে, সংসার ত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'লো কিন্তু কই তাদের ত' কিছুই হ'লো না, মা মুখ তুলে না চাইলে কিছু হবার যো নাই।

ক্ষেপা। সে কথা ঠিক বটে, তবে মা মুখ তুলে চাইবার মত ত' কিছু করা চাই, শুধু বসে বসে দিন গোঁয়ালে ত' চ'ল্‌বে না। সাধনার জন্য প্রাণপাত করা চাই; ডাকার মত ডাক্‌তে পারা চাই, তবে ত' মায়ের সাড়া পাবি। তুচ্ছ সংসারের জন্য কত ক'র্‌ছিস্, কুটুম্ব ভরণের জন্য অহোরাত্র নাকাল হ'য়ে যাচ্ছিস্, আর তাঁকে পাবার জন্য, সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর আরাধ্য বিশ্বেশ্বরীকে পাবার জন্য কি ক'র্‌ছিস্ বল দেখি, তা তাঁর দয়ার

অধিকারী হবি ? জগতে আস্‌ছিস্‌ আর যাচ্ছিস্‌। জগতের উৎপত্তি থেকে লয় অবধি কয়টা লোক মায়ের চিন্তা করে—তাঁকে পাবার জন্য কেঁদে অস্থির হয়, কেবল মাগ ছেলের সুখের জন্যই ত' কান্নাকাটি. তোরা কি জানিস্‌ না ; এ জগৎ মায়াময় ; অসার এর সুখ-সচ্ছন্দ ?

ভক্ত। হাঁ বাবা ঠিক ব'লেছেন, আমরা কেবল ফাঁকি দিয়ে কাজ সার্‌তে চাই ; জগতে এসে আমাদের কাণ্ড-কারখানা এমনি ভীষণ। আচ্ছা বাবা ! জগৎ কিসে উৎপত্তি হ'য়েছে ?

ক্ষেপা। এই তোকে বারণ করলুম নয়—আবার সেই বিকট তর্ক-শাস্ত্রের সমস্যা এনে ফেল্লি ?

ভক্ত ! বাবা ! বেশী নয়, এই কথাটী সামান্য ক'রে বুঝিয়ে দিন ; তাহা হ'লে আজ আর কোন কথা তুল্‌ব না।

ক্ষেপা। এই কথাটী কি সামান্য ? তবে একটু বলি শোন্‌! —পঞ্চভূতেই জগৎ সৃষ্টি হ'য়েছে—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। জগৎ ধ্বংস হ'য়ে ইহাতে মিলিত হয়, আবার এই থেকেই তৈয়ারী হয়। জগতের সব জিনিষই পঞ্চভূতময়, ধ্বংসের পর ঐ পাঁচ ভূতে লয় হয়। ক্রমে ঐ পাঁচ ভূতের মধ্যে চারটে, শেষের ভূতে আর্থাৎ ব্যোমে মিশিয়ে গিয়ে মহা ব্যোমরূপে পরিণত হয়। ঐ মহা ব্যোম অর্থাৎ মহাকাশের একটা সারভূত বীজ অর্থাৎ শক্তি আছে ; তাহা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—তবে কাজে প্রকাশ-মান হয়। ঐ বীজকে প্রকৃতি বল বা আদ্যাশক্তিই বল—ঐ থেকেই পুনরায় লুপ্ত ভূত সকলের উদয় বা সৃষ্টি হয়।

ভক্ত। প্রভু! কেমন ক'রে সৃষ্টি হয়—ভাল ক'রে বলুন—ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।

ক্ষেপা। সমস্তই মহাকাশে শেষে লয় হয়। ঐ মহাকাশ আবার ঐ বীজে লয় হ'য়ে যায়। কেবল ঐ বীজটীর কখন লয় হয় না—উহার ধ্বংস নাই। জগৎ কতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার কতবার এইরূপে উৎপত্তি হ'য়েছে—তা'র ঠিক নাই। ঐ বীজ থেকে সকলের আগে যখন মহাকাশ অঙ্কুরিত হয়—তখন একটী ভীষণ শব্দে ঐ বীজটী দুখানা হ'য়ে ফেটে যায়—তাহাই আমাদের প্রণব ওঁকার নাদ, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশ সৃষ্টি হ'ল—আর ঐ শব্দে বীজটী যে দুখণ্ড হ'য়ে গেল—উহার একটীর নাম প্রকৃতি, আর একটীর নাম পুরুষ; এই পুরুষ-প্রকৃতি দ্বারা আবার মহাকাশের সৃষ্টি হ'ল—তাহা হইতেই অন্য ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো, এখন সৃষ্টিতত্ত্ব কি বুঝ্‌লি? তাহা হইলে বুঝা গেল সর্ব্বজগতের আদি কারণ মহাকাশ—আর সৃষ্টির আদি কারণ পুরুষ-প্রকৃতি, এই পুরুষ-প্রকৃতি আবার সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী মহাবীজ হইতে সমুদ্ভূতা—সেই বীজই হইল ব্রহ্ম এবং উহার শক্তিই হইল আমার মা আদ্যাকালী—তাঁহার ক্ষয় নাই—তাঁহার ধ্বংস নাই। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই ক্ষয় আছে, তাঁহার উৎপত্তি নাই, সীমা নাই, ধ্বংস নাই তিনি সদাসর্ব্বদা পূর্ণ—তিনিই ভগবান্—সর্ব্ব কারণের কারণ-স্বরূপ। এখন তাঁহাতে স্ত্রীত্বও আরোপ করিতে পার, পুংস্ত্বও আরোপ করিতে পার। এইজন্য সাধনক্ষেত্রে কেহ তাঁহাকে মা

ব'লে ডাকে, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ব'লে ডাকে, কেউ বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব ব'লে ডাকে—আমার বিশ্বাস মা বল্লে যত সাধনার জোর হয়—এত আর কিছুতেই হয় না।

গায়কটী হাঁ করিয়া ক্ষেপার মুখে এই সমস্ত গভীর তত্ত্বকথা শুনিতেছিলেন। যখন শুনিলেন—ভগবানে পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব দুই আছে—তখন গাহিলেন—

মা আমার মাতা কি পিতা,
শ্যাম পুরুষ কি প্রকৃতি, কেমন আকৃতি,
তাঁহার মূরতি কে জানে কোথা।
ওমা রামরূপে ধনু—শ্যামরূপে বেণু
শ্যামারূপে অসি ধর মা সীতা,
তা না হ'লে মায়ের পায়ে গড়াগড়ি দিয়ে
পড়েন কি পিতা।

গান শুনিয়া ক্ষেপার ভাবকূপ উথলিয়া উঠিয়াছে—নয়ন হইতে দর-বিগলিত ধারা বহিতেছে—আর বলিতেছেন—আহা! দুই শক্তি—পুংশক্তি আর স্ত্রীশক্তি ; পুংশক্তি নিষ্ক্রিয় শবপ্রায় শিব—আর তার বক্ষে সর্ব্বকর্ম্মকুশলা মা আমার অবস্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন ; ইহাই হইল শিবের বুকে শ্যামা ব্রহ্মময়ী, তারা ত্রিগুণধারিণী। মা! তুমিই ত' সব—সত্ত্বও তুমি, রজও তুমি, তমও তুমি—তবে ভেদাভেদ কোথায় মা? জগন্ময়ী কোথায় তুমি নাই—ভালতেও তুমি মন্দতেও তোমার অস্তিত্ব বিরাজিত ; বেটী তবে ভ্রমবুদ্ধি কেন জন্মাইয়া দাও? এবার—

তোমার কর্ম্মডোর, মায়ার ঘোর কেটে ফেলেছি, আর কেন—কোলে নাও, ছেলে আর কতদিন এমন ক'রে থাক্‌বে, তুমি বাজীকরের মেয়ে—কখন সম্মুখে, কখন পাশে, কখন ভিতরে, কখন বাহিরে—এত লুকোচুরি কেন মা? জগৎ-প্রসবিনীর এ ছেলেখেলা কি আর ভাল দেখায়? তুমি কেবল মুখেই বল—"বামা! তোকে এখানে সেখানে রেখে বড় ভাবনা হয়—তুই পাগল ছেলে—পথ ভুলে পাছে কোথাও চলে যাস্। পিচ্ছিল সংসার-পথে পাছে পিছ্‌লে পড়ে পথভ্রান্ত হ'স্।" যদি এতই বুঝেছ; যদি এতই দয়া হ'য়েছে, তবে আর কেন মা? ক্ষেপার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—কচি ছেলে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া যেমন কাঁদিতে থাকে, পাগল বামা সেইরূপ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বালক-স্বভাব দিগম্বর ক্ষেপার এ ভাব দেখিলে বাস্তবিক মনপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়, কত প্রাণপোড়ান সাধনা করিলে যে জীব এ শিবভাব প্রাপ্ত হয়—তা সাধনায় অপটু আমরা, তাহার বর্ণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম। ভক্ত দুইটী কাছেই বসিয়া আছেন—স্থানটী অতি নির্জ্জন; বোধ হইতেছে—যেন তথায় দৈবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এদিকে সন্ধ্যাদেবীও নিজের ঘনান্ধকার সঙ্গে লইয়া তারাপীঠে ক্ষেপাকে কোলে লইতে আসিতেছেন দেখিয়া ভক্ত গায়কটী ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ক্ষেপার পদধূলি লইয়া গাহিলেন—

হরি বোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল।
ফুরাল খেলা, ভাঙ্গলো মেলা, আর কেন বিলম্ব বল॥

বিদেশে প্রবাসে, ভবপান্থবাসে, কিছু আর লাগলো না ভাল।
বাড়ীপানে মন, ছুটেছে এখন, মা মা ব'লে ঘরে চল॥
মায়ের আনন, করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল।
আছেন জননী, দিবস-রজনী, আশা-পথ চেয়ে কেবল॥
মায়ের প্রাণ টানে, সন্তানের পানে,
হেরিলে নয়নে ঝরে জল।
আহা মা আমার প্রেমের আধার,
আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল॥

ক্ষেপার প্রাণে বহুদিন হইতে মহাপ্রস্থানের ভাব জাগিয়াছে, এ সময় ঠিক এইরূপ ভাব তাঁহার মনপ্রাণ আলোড়িত করিতেছিল। হঠাৎ ভক্তটী তাঁহার প্রাণের কথা গানে ব্যক্ত করিলে, তিনি বিভোর প্রাণে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করত কেবল নয়নাশ্রু-নীরে অভিষেক করিতে লাগিলেন। কত যে কাঁদিলেন—তাহার ইয়ত্তা নাই, মুখে কথা সরে না—কেবল ভাবাবেশে অনর্গল অশ্রুপাত। ভক্তদ্বয়ও জগতের সমুদায় ভাবনা ভুলিয়া কেবল গান গাহিতেছেন। ক্ষেপা বলিলেন—বাড়ী যাবার ভাব জেগেছে, মায়ের কোল মনে পড়েছে, কেবল ঐ রকমের গান গাও বাবা!

ভক্ত গাহিলেন ;—

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।

সত্যরথে মন, কর আরোহণ,

প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,

সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, যতনে অতি গোপনে।

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,

শ্রান্ত হ'লে তাহে করিও বিশ্রাম,

পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পান্থনিবাসী জনে।

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,

প্রাণপণে দিও দো-হাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে॥

বামার চৈতন্য নাই—ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে স্থির হইয়াছেন। এদিকে রাত্রি হইয়াছে, ভক্তদ্বয় তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া বাসায় ফিরিতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ চৈতন্য না হয়, ততক্ষণ তাহারা তাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম কোলে তুলিয়া বসিয়া রহিল এবং চুপে চুপে তাঁহার মহা ভাবান্তরের কথা আন্দোলন করিতে লাগিল।

গায়ক ভক্তটী বলিল—প্রভু মহাপ্রস্থান করিলে বাস্তবিক তারাপীঠ অন্ধকার হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় ভক্তটী বলিল—এখন যে ভাব ও যেরূপ কথাবার্ত্তা দেখিতেছি—তাহাতে বোধ হয়—ক্ষেপা নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষেপাইয়া চলিয়া যাইবেন। যাহা হউক, এখন ভাই, প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসিতে হইবে, অধিক দিন বিলম্ব করিলে চলিবে না।

গায়ক।—তার আর কথা আছে, তুই একদিন অন্তর সকল কাজ ফেলে আস্‌তে হবে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ক্ষেপা উঠিয়া বলিলেন—কি গো! তোমরা এখনও ব'সে আছ—রাত যে অনেক হ'য়েছে?

ভক্ত। প্রভু! আপনাকে এমন অবস্থায় এ অন্ধকারে ফেলে কেমন ক'রে চলে যাই—তাই ব'সে আছি।

ক্ষেপা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—বাবা! তাতে আর ক্ষতি কি, আমাকে কার সাধ্য কি করে। আচ্ছা, তোমরা আজ এস। এই বলিয়া বামা উঠিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন। ভক্তদ্বয় তাঁহার পদধূলি লইয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিল। ক্ষেপার মহাভাব দেখিয়া কিন্তু তাহাদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল—তাই বিষাদভরা চিত্তে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিল।

উপসংহার।

কোনও ভয় ভীতি নাই; মৃত্যুর জন্য কোন আবেগ-উৎকণ্ঠা নাই, যে মৃত্যুর জন্য জীব ভয়ে জড়সড়, সদাই চকিত-ভীত; যাহার করাল ছায়া দর্শনে জীব শিহরিয়া উঠে; সে ভীষণ মৃত্যুভয়ে পুণ্যশ্লোক বামাচরণের ন্যায় উগ্রবীর্য্য সাধকের হৃদয় তিলমাত্র টলিল না। এত বড় একটা যন্ত্রণাদায়ক যে মৃত্যু-বিভীষিকা, যাহার জন্য কত কষ্ট কত যন্ত্রণা, সাধক বামাচরণ তাহার জন্য কিছুমাত্র অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন; নিজে কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করেন নাই; সমাগত ভক্তগণকেও তাঁহার অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই; নির্ভীক নিশ্চিন্ত ভাবে ত্রিতাপনাশিনী তারার পুত্র তারাদাস বামাচরণ অচল অটল ভাবে, সুখ শান্তির নিদানভূত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

যে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, যে অমৃত সাগরের সুশীতল সলিল পান করিবার জন্য বামাচরণের তৃষিত প্রাণ এ কয়দিন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; যাঁহার জন্য এ কয়দিন তিনি মন্দিরে অনবরত যাতায়াত করিয়া তারা মায়ের চরণে আবেদন-নিবেদন করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করত বলিয়াছিলেন মা ঘোর কলিকাল ভীষণ ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর

নয় মা, তৃষিত এ মরু হইতে আমাকে টানিয়া তোমার চির রসাল নন্দনে—তোমার দেব দুর্লভ চরণে একবার স্থান দাও। তারপর চুপে চুপে কি বলিতেন—"মৃত্যো! মামমৃতং গময়" হে মৃত্যু! তুমি আমাকে মাতৃত্বের অমৃত সাগরে লইয়া যাও। ইহা বলিতে বলিতে কেবল তারাদাসের তারা বহিয়া নয়ন ধারা প্রবাহিত হইয়া বুক ভাসিয়া যাইত। সমাধিস্থ হইয়া বহুক্ষণ থাকিবার পর চৈতন্য হইলে বলিতেন—কে বলে মৃত্যু ভীষণ—কে বলে মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যু যে মাতৃপ্রেম-হ্রদে ডুবিয়া নবজীবন লাভের একমাত্র উপায়। এস মৃত্যুপতি! তারাদাস বামাচরণ প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি আলোকবর্ত্তি হস্তে আমাকে পথ দেখাইয়া মাতৃ সমীপে লইয়া চল। যত দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বামাচরণও তত স্ফূর্ত্তিযুক্ত প্রাণে আত্মহারা হইয়া কেবল তারা নামে তারা মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তারপর মহা প্রস্থানের পূর্ব্বে সাধক তুষ্টিভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৩১৮ সালের ৩রা শ্রাবণ রাত্রে আমাদের এই সাধকপ্রবর, প্রেমিক-পাগল বামাচরণ ইহধাম ত্যাগ করিয়া তারা-পদে বিলীন হইয়াছেন। সেই পুণ্যাত্মা সাধক-শ্রেষ্ঠ, প্রেমাবতার, আশৈশব সরলপ্রাণ, চির কুমার বামক্ষেপা, এই আধিব্যাধি-প্রপীড়িত জ্বালাযন্ত্রণাময় মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চির-সুখশান্তির নিদান-ভূমি অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার বামাচরণ কিছুদিন এই মরজগৎবাসীকে প্রেম ও ভক্তির প্রাণারাম শিক্ষা

প্রদান করিয়া আবার সেই চির-আরাধ্য প্রেমার্ণবে ডুবিয়া পড়িয়াছেন। এখন তিনি যে প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা মানবের পক্ষে বড়ই লোভনীয়, বড়ই তৃপ্তিপ্রদ, সে প্রেমের লহরী-লীলায় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎ স্তম্ভিত—পুলকিত! জগজ্জননী প্রেমময়ী মা আমার প্রেমের পুতুলী, নয়নানন্দ রতনকে কোলে পাইয়া অর্দ্ধস্তিমিত, অতৃপ্তনয়নে তাহারি মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া আপন হৃদয়-সরোবরে যেরূপ স্নেহের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, ভক্ত-শিশুর প্রাণ তাহাতেই ডুবিয়া গিয়াছে। ভক্ত পাঠক! তোমরা মানস-নয়নে একবার সেই মাতা-পুত্রের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত বিমল বদন-প্রভা এবং সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হও। বামাচরণের গুণগরিমা বিমণ্ডিত মাতৃভক্তির কথা যথাসাধ্য এই পুস্তকে বিবৃত করিয়া আমিও ধন্য হইলাম! ইহাতে সাধক-চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কি হীনতা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ভক্ত পাঠকগণের প্রতি সে ভার অর্পিত হইল। বামাচরণ যাহার জন্য আজন্ম পাগল হইয়াছিলেন, যে বিশ্বজননীর সুশীতল চরণ-চ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আজীবন ভোগসুখ, বিষয়-বৈভব তুচ্ছ করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন—আজ তিনি সেই ভবারাধ্যা স্নেহময়ী মায়ের চরণে মিশিয়াছেন—ইহাতে আমাদের আনন্দ বই দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এরূপ সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, এ সৌভাগ্য কি এক জন্মের সাধনায় লাভ হইতে পারে? বামাচরণ বলিতেন—ডাকার মত ডাক্‌তে পার্‌লে

মা কখনই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, দুরন্ত কাঁদুনে ছেলেকে তিনি নিশ্চয়ই কোলে লইয়া থাকেন—আর কোলে না করিলে সে ছাড়িবেই বা কেন? ব্রহ্মশক্তি সমন্বিতে মা! তোমার যতই শক্তি থাকুক না কেন, বামার শক্তির কাছে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। বামাচরণ যথার্থ ডাকিতে শিখিয়াছিলেন, সে ডাক ব্রহ্ম-কটাহ ভেদ করিয়া মায়ের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই পুত্রগত-প্রাণ মা আমার কোলের ছেলেকে কোলে লইয়া তাহার চিরতৃষিত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দিলেন। আনন্দময় পুরুষ বামাচরণ আজ কয়েক বৎসর হইল বঙ্গদেশ অন্ধকার করিয়া আনন্দ-নিকেতনে চলিয়া গিয়াছেন। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদের মত তিনিও বলিতেন—"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল! ও মন চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।"

বামাচরণ মাতৃসন্নিধানে যাইবার সময়, আশা দিয়া গিয়াছেন—আমি চিরকালের জন্য যাইতেছি না, আবার আমি ফিরিয়া আসিব। তাই আমরা যুক্তকরে তারস্বরে আহ্বান করিতেছি—এস, এস বাঙ্গালার বামাচরণ! তুমি নূতন রূপে, নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া বাঙ্গলার গগন-পবন আবার পবিত্র কর। কালে কালে তোমার মত ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাসের একনিষ্ঠ সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার কোমল হিন্দুপ্রকৃতিকে সঞ্জীবমন্ত্রে দীক্ষিত করুন আর তোমার মত অষ্টসিদ্ধিযুক্ত সাধক, তোমার মত উগ্রবীর্য্য, ত্যাগী ও আজীবন সন্ন্যাসী, তোমার মত